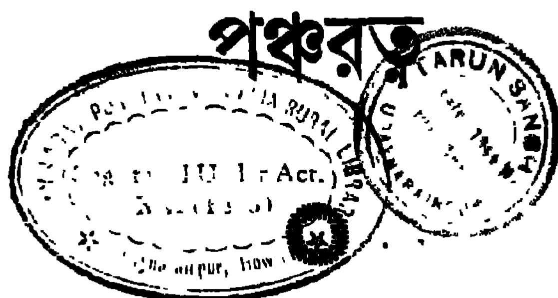
Approved as a Text-Book for M. E. Schools in Western Bengal
—*Calcutta Gazette, Nov 12, 1925*

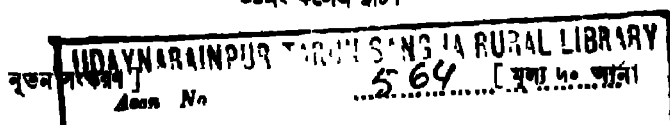
পঞ্চরত্ন



শ্রীযোগীন্দ্রনাথ সরকার সঙ্কলিত

———:•:———

কলিকাতা
সিটী বুক্ সোসাইটী,
৬৪নং কলেজ ষ্ট্রীট।



নূতন সংস্করণ] [মূল্য ৸০ আনা

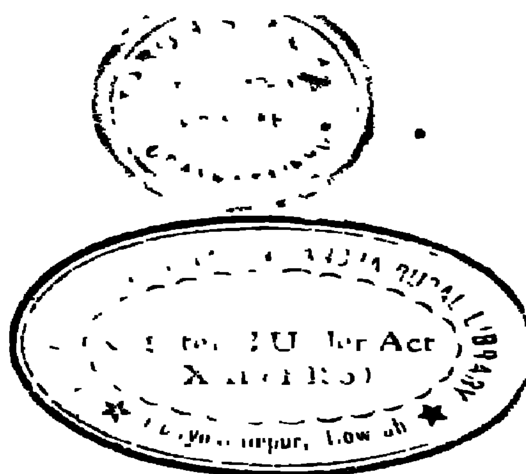
প্রকাশক :—শ্রীকেশবচন্দ্র চৌধুরী,
৬৪নং কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

প্রিণ্টার :—এন্, মুখার্জ্জি, বি-এ,
আর্ট প্রেস, ওয়েলিংটন্ স্কোয়ার।



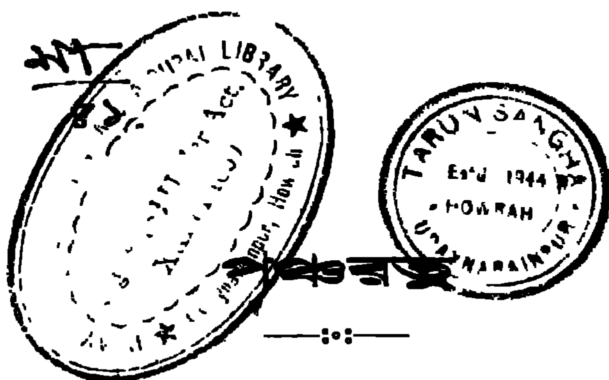
সূচী







রাজা রামমোহন রায়



—:o:—

রামমোহন

তুঙ্গশৃঙ্গ গিরি যে জল বৃষ্টি ঝটিকা সহিয়া যুগ যুগ দণ্ডায়মান থাকে, তাহা কি শূন্যকে আশ্রয় করিয়া? কখনই নহে। তাহা সুদৃঢ় ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত, এবং যে সকল আভ্যন্তরীণ ধাতুপুঞ্জের সংঘাত দ্বারা তাহার দেহ গঠিত, সে সকল ধাতুপুঞ্জও ঘন-নিবিষ্ট এই জন্য; তদ্ভিন্ন গিরি কখনই দণ্ডায়মান থাকিতে পারিত না। গিরি যে দাঁড়াইয়া আছে, তাহা নিরন্তর সংগ্রাম করিয়া; নিরন্তর বর্ষার জলধারা তাহার অঙ্গ-সন্ধিকে শিথিল করিতেছে, তাহার দৈহিক ধাতু সকলকে ধৌত করিয়া লইয়া যাইতেছে, বহুল শিলাখণ্ডকে অশনি-নিনাদে শৃঙ্গ হইতে পাদদেশে পাতিত করিতেছে, চক্ষের নিমিষে তরু-লতার শ্রীসৌন্দর্য্য সকলই হরণ করিয়া লইতেছে; আবার কখনও বা ভীষণ ভূকম্পে ঐ গিরিদেহ বিদারিত হইয়া জ্বালামুখী প্রকাশ পাইতেছে; শত শত বন-প্রদেশ ভগ্ন ও বিশ্লিষ্ট হইয়া নেত্রের অগোচর হইয়া যাই-

তেছে ; কোথাও বা প্রচণ্ড গ্রীষ্মের সময় দাবানল প্রজ্বলিত হইয়া, দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ, অবিশ্রান্ত জ্বলিয়া, সুদূর-প্রসারী অরণ্যানী সকলকে ভস্মীভূত করিতেছে। গিরির জীবন কি সংগ্রামের জীবন! কিন্তু এই সংগ্রামের মধ্যেও গিরি দণ্ডায়মান আছে ; শীতাতপ সহিয়া বিধাতার কাজ করিতেছে ; গিরির ভিত্তি দৃঢ়, গিরির দেহের বন্ধন দৃঢ় বলিয়া। এ জগতে একজন মহামনা ব্যক্তিকে আমার এই গিরির সহিত তুলনা করিতে ইচ্ছা হয়। কোন্ গিরি এমন আছে যাহার শীতাতপের সহিত সংগ্রাম নাই? তেমনি কোন্ মহৎ চরিত্র এমন আছে বিবিধ প্রতিকূল অবস্থার সহিত যাহার সংঘর্ষণ নাই? আবার কোন্ গিরি এমন আছে যে নিজের আভ্যন্তরীণ দৃঢ়তার গুণে দণ্ডায়মান নয়? তেমনি কোন্ মহৎ চরিত্রই বা এমন আছে যাহা আভ্যন্তরীণ উপাদান সকলের গুণেই মহৎ নয়?

এ জগতে যিনি উঠেন তিনি সাধারণের মধ্যে জন্মিয়া, সাধারণের মধ্যেই বাড়িয়া, সাধারণের উপরে মস্তক তুলিয়া দাঁড়ান ; তিনি আভ্যন্তরীণ মাল মশলার সাহায্যেই বড় হইয়া থাকেন। কুষ্মাণ্ড যেমন যষ্টির সাহায্যে মাচার উপরে উঠে, তেমনি কোন্ কাপুরুষ, কোন্ অলস শ্রমকাতর মানুষ, কোন্ হীনতেজা নতজানু মানুষ, কোন্ অবিশ্বাসী ক্ষীণ-শক্তি মানুষ, কেবল মাত্র অপরের সাহায্যে এ জগতে প্রকৃত মহত্ত্ব লাভ করিয়াছে? এ জগতে উঠিয়া, পড়িয়া, বহিয়া, সহিয়া,

ভাঙ্গিয়া, গড়িয়া, কাঁদিয়া, কাটিয়া মানুষ হইতে হয়; "নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়," মনুষ্যত্ব বা মহত্ব লাভের অন্য রাস্তা নাই। ঈশ্বর মানুষের সহিত চুক্তি করিয়া অল্প আয়াসে মহত্ব প্রদান করেন না।

আমি এরূপ একটি মহৎ চরিত্রের আলোচনা করিতে যাইতেছি। তিনি রামমোহন রায়। নচিকেতা তাঁহার পিতাকে বলিয়াছিলেন,—"শতানামেমি প্রথমঃ", আমি শত-জনের মধ্যে প্রথম হইতে চাই। রামমোহন রায় যে কালে জন্মিয়াছিলেন, সে সময়ে এদেশবাসীদিগের ভিতরে লক্ষের মধ্যে—লক্ষের কেন, কোটির মধ্যে—তিনি প্রথম হইয়াছিলেন বলিলে কি অত্যুক্তি হয়? সে কালের লোকের কথাই বা বলি কেন? তাঁহার জন্মের পর এই ত শত বৎসর অতীত হইয়াছে, কে তাঁহার স্থান অধিকার করিতে পারিয়াছে? কে প্রকৃত মহত্বগুণে তাঁহার ত্রিসীমার মধ্যে আসিতে পারিয়াছে?

বলিতে কি, শঙ্করের পর এরূপ মনস্বী ও তেজস্বী পুরুষ আর কয়জন এদেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন? তাঁহার প্রদীপ্ত দিবালোকের নিকটে আমরা কি খদ্যোত নহি? আমরা কি সেই প্রদীপ্ত ধূমকেতুর পুচ্ছ-লগ্ন জ্যোতিঃকণিকা-মাত্র নহি?

কিন্তু রামমোহন রায় যে লক্ষের মধ্যে এক হইয়া দাঁড়াইলেন, তাহা কিরূপে? যেরূপ ক্ষুদ্র গিরিরাজির মধ্যে অত্যুন্নত গিরিশৃঙ্গ দণ্ডায়মান থাকে, তেমনি যে সাধারণ

প্রজাপুঞ্জের মধ্যে তিনি উন্নত-শিরা হইয়া উঠিয়াছিলেন তাহা কোন্ গুণে? তাহা পূর্ব্বোল্লিখিত গিরিদেহের ন্যায় আভ্যন্তরীণ উপাদান সকলের সাহায্যে। এইরূপ কতকগুলি চরিত্রগত উপাদানের উল্লেখ করিব। √

প্রথম উপাদান তাঁহার অন্তর্নিহিত অসাধারণ মানবাত্মার মহত্ত্ব-জ্ঞান। মানবের আত্মাকে তিনি অতি পবিত্র চক্ষে দেখিতেন; মনে করিতেন, এই মানবাত্মা সেই বিশ্বাত্মারই অঙ্গীভূত; তাঁহা হইতে উৎপন্ন; তাঁহা-দ্বারা বিধৃত এবং তাঁহাকে প্রাপ্ত হওয়াই ইহার নিয়তি; ইহার আশা ও শক্তি অসীম। সকল প্রকার সামাজিক দাসত্ব ও রাজনৈতিক অত্যাচার ও দাসত্বকে তিনি এই জন্য অন্তরের সহিত ঘৃণা করিতেন; কারণ তদ্দ্বারা মানবাত্মা শৃঙ্খলিত, শক্তিহীন, ও আত্ম-মহত্ত্ব-জ্ঞানে বঞ্চিত হয়। এই কারণে পৃথিবীর যে কোনও বিভাগে লোকে স্বাধীনতা লাভের চেষ্টা করিত, তাহারই সহিত তাঁহার হৃদয়ের যোগ হইত; এবং স্বাধীনতা-লাভ-প্রয়াসে কোনও জাতি অকৃতকার্য্য হইতেছে জানিলে তিনি মর্ম্মাহত হইতেন। ইটালীয়ানগণ অনেক চেষ্টার পর যখন অষ্ট্রীয়াবাসিগণের নিকট পরাস্ত হইল, তখন সেই সংবাদে রামমোহন রায় কলিকাতাতে শয্যাস্থ হইলেন, নিমন্ত্রণ-রক্ষা করিতে পারিলেন না। অপর দিকে স্পেনে যখন নিয়ম-তন্ত্র প্রণালী প্রতিষ্ঠিত হইল, তখন তিনি আনন্দে কলিকাতা টাউন-হলে ভোজ দিলেন। তাঁহার ঊর্দ্ধতন কর্ম্ম-

চারী ডিগ্‌বী সাহেব লিখিয়াছেন যে, তাঁহার নিকট কর্ম্ম করিবার সময় ডিগ্‌বী অনেকবার দেখিয়াছেন যে, রামমোহন রায় ফরাসী বিপ্লবের বিবরণ জানিবার জন্য ব্যগ্রতা সহকারে বিলাতী ডাকের অপেক্ষা করিয়া থাকিতেন; যদি দেখিতেন যে, স্বাধীনতা পক্ষের পরাজয় হইতেছে, তাহা হইলে দরদর ধারে তাঁহার দু কপোলে অশ্রুধারা বহিত। কুমারী কলেট্‌ বলিয়াছেন যে, ইংলণ্ড গমন কালে গুড্‌ হোপ্‌ অন্তরীপে জাহাজে পড়িয়া গিয়া রামমোহন রায়ের পা ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। কিন্তু যখন তিনি দেখিলেন যে, ফরাসী জাহাজে স্বাধীনতার পতাকা উড্ডীন হইয়াছে, তখন সেই ভগ্নপদ লইয়াই সেই জাহাজে গিয়া সেই পতাকাকে অভিবাদন করিবার জন্য ব্যগ্র হইলেন। তাঁহার জাহাজের কাপ্তেন অনেক নিষেধ করিলেন; সে নিষেধ তিনি কোন মতেই শুনিলেন না; ভগ্নপদে অতিকষ্টে ফরাসী জাহাজে গিয়া সেই পতাকাকে অভিবাদন করিলেন। আসিবার সময় ফ্রান্সের জয়ধ্বনি করিতে করিতে আসিলেন।

তাঁহার ইংলণ্ড-বাস-কালে, ১৮৩১ সালে পার্লামেণ্ট্‌ মহাসভাতে সুপ্রসিদ্ধ Reform Billএর বিচার উপস্থিত হয়। ঐ আইনের দ্বারা ইংলণ্ডের প্রজাবর্গের স্বাধীনতার ক্ষেত্র বিস্তৃত করিবার প্রস্তাব হয়। রামমোহন রায় সেই প্রস্তাবে আপনাকে এতদূর নিক্ষেপ করিয়াছিলেন যে, প্রকাশ্য ভাবে বলিয়াছিলেন, ঐ আইন বিধিবদ্ধ না হইলে তিনি

ইংলণ্ডের অধিকারে আর থাকিবেন না ; তাঁহার পৈতৃক ও স্বোপার্জ্জিত সমুদয় সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া স্বাধীনতার ক্রীড়াভূমি আমেরিকাতে গিয়া বাস করিবেন। কি স্বাধীনতাপ্রিয়তা ! কি মানবাত্মার মহত্ত্ব-জ্ঞান !

এই মানবাত্মার মহত্ত্ব-জ্ঞান আর একদিকে অসাধারণ আত্মমর্য্যাদা জ্ঞানের আকার ধারণ করিয়াছিল। তাঁহার চরিত্রের এমনি একটা প্রভাব ছিল, এমনি একটা মহাপুরুষোচিত গাম্ভীর্য্য ছিল যে, তাঁহাকে কোনও ছোট কাজের জন্য অনুরোধ করিতে সাহসী হওয়া দূরে থাকুক, তাঁহার বন্ধু বান্ধব তাঁহার সমীপে ছোট কথার অবতারণা করিতেও সাহসী হইতেন না। তাঁহার বন্ধু উইলিয়াম্ এডাম্ একদিনের একটী ঘটনার বিবরণ লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা সকলেরই পাঠ করা উচিত। ঘটনাটি এই—জ্যৈষ্ঠ মাসের দারুণ গ্রীষ্মের সময় একদিন অপরাহ্ণে, রামমোহন রায় হঠাৎ এডামের ভবনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এডাম্ দেখিলেন—তাঁহার মুখে ভয়ানক উত্তেজনার চিহ্ন। দেখিয়া তাঁহার ভয় হইল। রামমোহন রায় বলিলেন,—"তুমি যদি কিছু মনে না কর, আমার গায়ের উপরকার পরিচ্ছদ খুলি।" পরিচ্ছদ উন্মোচন করিয়া বলিলেন,—"জল ! জল !" ত্বরায় জল দেওয়া হইল। জলপান করিয়া একটু সুস্থ হইয়া বলিলেন,—"আমার জীবনের সর্ব্ব প্রধান আঘাত ও সর্ব্ব প্রধান দুঃখ আজ পাইয়াছি। বিশপ্ মিড্‌ল্‌টন্

আজ আমাকে এই বলিয়া প্রলোভন দেখাইয়াছেন যে, খ্রীষ্টধর্ম্ম অবলম্বন করিলে আমার পদ আরও বড় হইবে। ছিঃ! ছিঃ! আমাকে এত ছোটলোক মনে করে!" এডাম্ বলিয়াছেন,—"ইহার পরে রামমোহন রায় আর বিশপ্ মিড্‌ল্‌টনের মুখদর্শন করেন নাই।" বৈষয়িক সুখের প্রলোভন দেখাইয়া ধর্ম্মে প্রবৃত্ত করা,—ইহা তাঁহার চক্ষে অমার্জ্জনীয় অপরাধ, অসহনীয় অপমান বলিয়া গণ্য হইয়াছিল।

কেবল ইহা নহে, মানবাত্মার মহত্ত্ব-জ্ঞান অন্তর্নিহিত ছিল বলিয়াই তাঁহার স্বাবলম্বন-শক্তি অপরিসীম ছিল। নিজের গূঢ় আত্ম-শক্তিতে এত দূর বিশ্বাস ছিল যে, কিছুতেই তাঁহাকে কেহ দমাইতে পারিত না; কোনও বিঘ্ন বা বাধা তাঁহাকে স্বকার্য্যসাধনে বিমুখ বা নিরুদ্যম করিতে পারিত না। যাহা একবার করণীয় বলিয়া অনুভব করিতেন, ...তে তাহাকে ধরিতেন; এবং পূর্ণমাত্রায় তাহা না করিয়া নিরস্ত হইতেন না। বুল্ ডগ্ নামক কুকুরের এইরূপ খ্যাতি আছে যে, সে একবার যে প্রাণীকে কাম্‌ড়াইয়া ধরে, নিজের দেহকে মস্তক হইতে বিচ্ছিন্ন করিলেও সে কামড় ছাড়ে না। রামমোহন রায়ের বজ্রমুষ্টি বুল্ ডগের কামড়ের ন্যায় ছিল; তাঁহার অভীষ্ট কার্য্য হইতে কিছুতেই তাঁহাকে বিচলিত করিতে পারিত না। বরং সে পথে যতই বিঘ্ন উপস্থিত হইত, ততই তাঁহার বীর-হৃদয় আনন্দিত হইত।

ঘোড়দৌড়ের ঘোড়া যেমন সম্মুখে বেড়া দেখিলে আনন্দিত হয় যে, উল্লম্ফন ও উল্লঙ্ঘনের উপযুক্ত কিছু পাওয়া গিয়াছে, তেমনি তাঁহার নির্ভীক হৃদয় বিঘ্ন-বাধা দেখিয়া আনন্দিত হইত যে, উল্লম্ফন ও উলঙ্ঘনের উপযুক্ত কিছু আছে। বিঘ্ন দেখিয়া হঠিয়া যাওয়া, ভয় প্রদর্শনে ভীত হওয়া, প্রাণভয়ে কাতর হওয়া, লোকের প্রতিকূলতা বশতঃ সংকল্পিত অনুষ্ঠান পরিত্যাগ করা, তিনি কাপুরুষতা ও নিজ শক্তির অবমাননা বলিয়া মনে করিতেন। ব্যাপ্টিষ্ট্ মিশনের মিশ্‌নারিগণ যখন তাঁহার প্রণীত কোন পুস্তক আপনাদের ছাপাখানায় মুদ্রিত করিতে অস্বীকৃত হইলেন, তখন তিনি নিজে মুদ্রাযন্ত্র ক্রয় করিয়া, নিজের গ্রন্থ তাহাতে মুদ্রিত করিয়া তবে ছাড়িলেন। স্কচ্ মিশ্‌নারী এলেক্‌জাণ্ডার ডাফ্ যখন তাঁহার আহ্বানে কলিকাতাতে উপস্থিত হইলেন, এবং প্রথম মিশ্‌নারী স্কুল স্থাপনের পথে সুমহৎ বিঘ্ন দেখিয়া তাঁহার শরণাপন্ন হইলেন; যখন সহরের ভদ্রলোকেরা এমনি বিরোধী হইলেন যে, স্কুলের জন্য দেশীয় বিভাগে একটি বাড়ী ভাড়া করা ও পড়িবার জন্য বালক সংগ্রহ করা ডাফের পক্ষে কঠিন হইয়া উঠিল, তখন রামমোহন রায়কে এই বিঘ্ন বাধার কথা জানাইলে তিনি ডাফের স্কুল বসাইবার ভার স্বয়ং গ্রহণ করিলেন। তিনি ত কিছুতেই পিছু-পা হইবার লোক ছিলেন না। স্বয়ং উদ্যোগী হইয়া ব্রহ্মসভার পূর্ব্বাশ্রিত ফিরিঙ্গী কমল বসুর বাড়ী ডাফের স্কুলের জন্য স্থির করিয়া

দিলেন; এবং আপনার বন্ধুবান্ধবের পরিবার হইতে প্রথম ছয়টি ছাত্র সংগ্রহ করিয়া আনিলেন। ইহা করিয়াও নিরস্ত হইলেন না; স্কুল খুলিবার দিন নিজে উপস্থিত হইয়া বালকদিগকে উৎসাহিত করিলেন; এবং তৎপরে সর্ব্বদা গিয়া স্কুলের কার্য্য পরিদর্শন দ্বারা ও পরামর্শ-দানাদি দ্বারা ডাফকে উৎসাহিত করিতে লাগিলেন। তিনি বিলাত গমনার্থ উদ্যত হইলে তাঁহার প্রতিপক্ষগণ তাঁহাকে জাতিচ্যুত করিবার ও পৈতৃক সম্পত্তিতে বঞ্চিত করিবার ভয় প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। তিনি স্বীয় অভীষ্ট সাধনে প্রতিজ্ঞারূঢ় হইয়া নিজের সহিত যাইবার জন্য পাচক ব্রাহ্মণ ও হিন্দু ভৃত্য সংগ্রহ করিলেন। যে সময়ে সমুদ্রে পা বাড়াইলেই জাতিচ্যুত হইবার ভয় ছিল, সে সময় বিলাত গমনের জন্য পাচক ব্রাহ্মণ ও হিন্দু ভৃত্য সংগ্রহ করা কিরূপ কঠিন কাজ ছিল, সহজেই অনুমিত হইতে পারে। তাহাতেও তিনি পশ্চাদ্‌পদ হইলেন না। যিনি ষোড়শ বর্ষ বয়সে পিতা কর্ত্তৃক গৃহতাড়িত হইয়াও স্বীয় সংকল্প ত্যাগ করেন নাই, তাঁহার পক্ষে ইহা কিছুই বিচিত্র ছিল না।

মানবাত্মার মহত্ত্ব যে জানে না, স্বাবলম্বন শক্তি তাহার আসে না। এ জগতে মানুষ আপনার ঘর আপনি রচনা করে। তুমি বড় হইয়া দাঁড়াইবে, কি ছোট হইয়া থাকিবে তাহা তোমারই হাতে। বিঘ্ন বাধা, পাপ প্রলোভন, জীবনের সমস্যা, সকলেরই পথে উপস্থিত হয়; তাহার উপরে উঠা

বা নীচে পড়িয়া যাওয়া, ইহার উপর বড় বা ছোট হওয়া নির্ভর করে। রামমোহন রায় উপরে উঠিয়াছিলেন, এই জন্য তিনি বড়; আর তুমি আমি নীচে পড়িয়া যাই, এই জন্য আমরা ছোট। তিনি যে উপরে উঠিয়া ছিলেন তাহারও ভিতরকার কথা—নিজের শক্তি-সামর্থ্যে ও মানবাত্মার মহত্বে অপরাজিত বিশ্বাস।

কিন্তু তাঁহার প্রকৃতিতে কি বিরুদ্ধগুণ সকলের সমাবেশই ছিল! এই উৎকট মানবাত্মার মহত্ত্ব-জ্ঞান ও তজ্জনিত স্বাধীনতা-প্রবৃত্তির পার্শ্বেই প্রগাঢ় সাধুভক্তি বিদ্যমান ছিল। তিনি মানবাত্মার মহত্ব ঘোষণার জন্য ধর্ম্মবিষয়েও মানবের বিচারশক্তিকে পূর্ণ অধিকার দিলেন; কিন্তু তাহা করিতে গিয়া অতীত হইতে একেবারে পা তুলিয়া লইতে পারিলেন না। যুক্তিকে শাস্ত্রানুসারিণী করিবার জন্য, অথবা শাস্ত্রকে যুক্তির অনুগামী করিবার জন্য, কতই না শক্তি ও শ্রম ব্যয় করিলেন! তিনি যে কালে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, সে সময়ে ফরাসী বিপ্লবের তরঙ্গাঘাতে সমুদয় দেশ কম্পিত হইতেছিল। সে সময়ে এক শ্রেণীর মানুষ দেখা দিয়াছিল, যাহারা শাস্ত্রবিধি, গুরু পুরোহিত প্রভৃতিকে পরিত্যাগ করিয়া মানবের চিন্তাকে স্বাধীন ভাবে ও অসঙ্কোচে জীবনের সর্ব্ববিভাগে প্রসারিত হইতে দিবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছিল। ইহারা ধর্ম্মে সংশয় ও নাস্তিকতাবাদ অবলম্বন করিয়াছিল। রামমোহন রায় ইংলণ্ডে ও ফ্রান্স

দেশে এই শ্রেণীর অনেক মানুষ দেখিয়াছিলেন। তাহাদের নমুনা এ দেশেও কিছু কিছু দেখিয়া গিয়াছিলেন। তিনি ইহাদিগকে দেখিয়া অবজ্ঞাতে মুখ ফিরাইয়াছিলেন। প্রকাশ্যভাবে বলিয়াছিলেন, "আমি যদি কখনও পরিবার পরিজনকে ইউরোপে আনি, এই শ্রেণীর লোকের সহিত কখনই আমার পুত্র কন্যাদিগকে পরিচিত হইতে দিব না।" তিনি স্বাধীন চিন্তাকে অনেক দূরে ছুটিতে দিতে প্রস্তুত ছিলেন; কিন্তু তাহা বল্গাবিহীন অশ্বের ন্যায় নহে; পরন্তু "সদশ্বা ইব সারথেঃ," সারথির সদশ্বের ন্যায়, ভক্তির লাগাম মুখে দিয়া, শাস্ত্র ও সাধুজনের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভক্তি রাখিয়া। এই সাধু-ভক্তি বা Reverence তাঁহার চরিত্রের দ্বিতীয় উপাদান ছিল।

তৃতীয় উপাদান—সকল মহাজনের কার্য্যের মূলে যাহা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা তাঁহারও কার্য্যের মূলে ছিল। তাহা এই—"যতোধর্ম্ম স্ততোজয়ঃ"—এই বিশ্বাস। অর্থাৎ ইহা অনুভব করা যে, এই ভৌতিক জগৎ যেমন দুর্ভেদ্য কার্য্য-কারণ-শৃঙ্খলে আবদ্ধ, তেমনি মানবের জীবন ও মানবসমাজ দুর্লঙ্ঘ্য ধর্ম্মনিয়মের দ্বারা শাসিত। এক মহাশক্তি বা মহতী ইচ্ছা হইতে মানব-জীবন ও মানবসমাজ উদ্ভূত হইয়াছে, সেই মহতী ইচ্ছার দ্বারা বিধৃত হইতেছে, সেই ইচ্ছা ও সেই শক্তির দ্বারা মঙ্গলের পথে নীত হইতেছে। "স সেতু বিধৃতি-রেষাং লোকানাং অসম্ভেদায়", তিনিই সেতুস্বরূপ হইয়া

সকলকে ধারণ করিতেছেন। মানব-জীবন তাঁহারই শাসনাধীন, সুতরাং এখানে ধর্ম্মের জয় অনিবার্য্য। যাহা সত্য বলিয়া বুঝি, ধর্ম্ম বলিয়া যাহা অনুভব করি, তাহার অনুসরণ করা আমাদের একমাত্র কর্ত্তব্য; ফলাফল সেই ধর্ম্মাবহ পরম পুরুষের হস্তে। এই সুদৃঢ় বিশ্বাস, এই মহৎ ভাব হইতেই সকল ধর্ম্ম-বীরের বীরত্ব উৎপন্ন হইয়াছে। রামমোহন রায়ের বীরত্বও ইহা হইতে উঠিয়াছিল। সে বীরত্বের কথা যখন স্মরণ করি, তখন হৃদয় স্তম্ভিত হয়। বর্ত্তমান কালে যাঁহারা তাঁহারই প্রদর্শিত পথে অগ্রসর হইয়াছেন, তাঁহারই বাণী ধরিয়া সংস্কারক দলে নাম লিখাইয়াছেন, তাঁহাদের মুখ কত সময় বিষাদে ম্লান দেখিতেছি; তাঁহাদের মুখে নিরাশার ভাষা কতবার শুনিতেছি। কেহ বলিতেছেন,—"কই, একেশ্বরের অর্চ্চনা ত দেশে স্থাপিত হইল না।" কেহ বলিতেছেন, "আমরা কয়জন মরিয়া গেলে আর ইহার নাম গন্ধও থাকিবে না," ইত্যাদি; যেন তাঁহারাই ধর্ম্ম বিধানের হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা। যখন এই সব ভাবি, অমনি রামমোহন রায়ের কথা স্মরণ হয়,—দুই ছবিতে কি প্রভেদ! ইহারা সহস্র সহস্র সমভাবাপন্ন ব্যক্তির দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়াও সাহসকে রাখিতে পারিতেছেন না, আর রামমোহন রায় একাকী দণ্ডায়মান হইয়া কি সাহসে যুদ্ধ করিয়াছিলেন! তাঁহার বন্ধুগণ শত্রু হইল; সঙ্গিগণ ছাড়িয়া গেল; অনুগত ব্যক্তিগণ বিশ্বাস-ঘাতক হইয়া বৈরীদলে প্রবেশপূর্ব্বক তাঁহাকে নির্য্যা-

তন করিতে প্রবৃত্ত হইল; এরূপ অবস্থাতেও যে দুই চারি জন ইউরোপীয় প্রচারক তাঁহাকে বন্ধুভাবে আলিঙ্গন করিয়াছিলেন তাঁহারা তাঁহাকে ত্যাগ করিলেন; ধর্ম্ম-সভার সভ্যগণ তাঁহার প্রাণনাশ পর্য্যন্ত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল; তাঁহাকে সশস্ত্র হইয়া বেড়াইতে হইল; অধিক কি, তাঁহার নিজের জননী কুচক্রী লোকের পরামর্শে তাঁহাকে বিষয় হইতে বঞ্চিত করিবার জন্য মোকদ্দমা উপস্থিত করিলেন; জনৈক রাজা তাঁহাকে বহু বৎসর ধরিয়া মোকদ্দমার পর মোকদ্দমা তুলিয়া কষ্ট দিলেন; বিপক্ষগণ তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্রের নামে মিথ্যা মোকদ্দমা তুলিয়া তাঁহাকে কারাগারে নিক্ষেপ করিবার প্রয়াস পাইলেন। বল, আমাদের কাহার জীবনে এরূপ নির্য্যাতন ঘটিয়াছে? কে এরূপ একাকী ও অশরণ হইয়াছি? অথচ ইহাতে তাঁহাকে একদিনের জন্যও ভীত অথবা স্বীয় কার্য্য হইতে পরাঙ্মুখ করিতে পারে নাই। তিনি এই সকলের মধ্যে অবিচলিত থাকিয়া বলিলেন,—"এমন দিন আসিতেছে, যখন আমার নির্য্যাতনকারিগণের বংশধরগণ আমাকে দেশের হিতৈষী বন্ধু বলিয়া ধন্যবাদ করিবে—ধর্ম্মের জয় হইবেই হইবে।" ঐরূপ অবস্থাতে এরূপ বলিতে পারাই মহত্ত্ব। সকল প্রতিকূলতার উপরে উঠিয়া দাঁড়াইতে পারাই মহত্ত্ব। অসংখ্য গোলাগুলির মধ্যে অবিচলিত চিত্তে অগ্রসর হইয়া সত্যের নিশান প্রোথিত করিতে পারাই বীরত্ব। এই বীরত্বের পশ্চাতে ধর্ম্মরাজ্যের বিধাতা ধর্ম্মাবহ পরম পুরুষের ধর্ম্ম-

শাসনে অবিচলিত বিশ্বাস ছিল। তদ্ভিন্ন এরূপ বীরত্ব জীবনে আসে না।

ইহা হইতেই তাঁহার চরিত্রের আর একটি উপাদান উৎপন্ন হইয়াছিল—তাহা আপনার জীবনকে ও শক্তি সমুদয়কে ঈশ্বরের ন্যস্ত সম্পত্তি বলিয়া অনুভব করা। আমার মানসিক বৃত্তি, দেহের বল, লৌকিক ও সামাজিক সুবিধা, সবই মঙ্গলময় পুরুষের গচ্ছিত ধন, তাঁহার ইচ্ছানুসারে ব্যয় হইবার জন্য, তাঁহারই প্রিয় কার্য্যসাধনের জন্য,—এই ভাব। ইহা ব্যতীত কোনও মহাজনের জীবন মহৎ হয় নাই; কোনও মানুষ এ জগতে মহৎ কার্য্য করিতে সমর্থ হন নাই। সকল মহামনা মানুষের জীবনে এক অপূর্ব্ব বাধ্যতার ভাব দেখা গিয়াছে। কে যেন তাঁহাদিগকে বলপূর্ব্বক ধরিয়া কাজ করাইয়া লইয়াছে; বাধ্য করিয়া খাটাইয়াছে; তাঁহারা অনুভব করিয়াছেন যে, তাঁহারা যাহা করিতেছেন, তাহা না করিয়া পার নাই। সেণ্ট্ পল্ একস্থলে বলিয়াছেন, "The love of Christ constraineth me,—অর্থাৎ যীশুর প্রেম আমাকে বাধ্য করিতেছে।" কেবল পলই যে এই প্রকার বাধ্যতা অনুভব করিয়াছিলেন, তাহা নহে। প্রত্যেক মহামনা মানুষ এইরূপ বাধ্যতা অনুভব করিয়াছিলেন। এই যে জীবনের ভিতরে দায়িত্ব-জ্ঞান, এই যে অস্ফুট কিন্তু নিরন্তরোদ্বেলিত বাধ্যতা-জ্ঞান, ইহা ভিন্ন কে কবে বড় হইয়াছে? কে কবে বজ্রমুষ্টিতে কার্য্য করিয়াছে? কে কবে বীরের ন্যায় সংগ্রাম-ক্ষেত্রে

দাঁড়াইয়াছে? রামমোহন রায় ভাবিয়াছিলেন, যে যাহা বলে বলুক, যে যাহা করে করুক, লোকে দেখুক আর না দেখুক, আমার জীবনের পূর্ণতা আমি লাভ করি, আমার প্রতি যে কার্য্যভার পড়িয়াছে তাহা আমি সাধন করিয়া যাই। তুমি আমি যদি বিশ্বাসে বা প্রেমে এতটা ধরিতে পারিতাম, তাহা হইলে আমরাও বীরের ন্যায় কাজ করিয়া যাইতে পারিতাম। এই দায়িত্ব-জ্ঞান হইতেই তাঁহার চরিত্রের আর একটি গুণ ফুটিয়াছিল। তিনি যে কাজে হাত দিতেন তাহা পূর্ণাঙ্গ না করিয়া ছাড়িতেন না। যাহা করিবেন বলিয়া ধরিতেন তাহা সুসম্পন্ন করিতেন। বালকের ন্যায় লঘুভাবে কাজে হাত দেওয়া, অর্দ্ধেক মন দিয়া সে কার্য্য করা, স্বল্প প্রতিবন্ধক দেখিয়াই নিরস্ত হওয়া, ইহা তাঁহার প্রকৃতি-বিরুদ্ধ ছিল। তিনি ১৮১৭ সালে সহমরণের বিরুদ্ধে সমর ঘোষণা করিলেন, সভাসমিতিতে সেই বিচার চলিল, গ্রন্থের পর গ্রন্থ প্রকাশিত হইতে লাগিল; সহমরণ স্থলে বলপ্রয়োগাদি করে, কি না, দেখিবার জন্য বন্ধু বান্ধবকে শ্মশানে প্রেরণ করিতে লাগিলেন; লর্ড উইলিয়ম্ বেন্টিঙ্ক্‌কে বিধিমতে সাহায্য ও উৎসাহ দান দ্বারা সবল করিতে লাগিলেন; বহুজনের স্বাক্ষর করাইয়া সহমরণনিবারণার্থ আবেদন পত্র রাজগোচরে প্রেরণ করিলেন। অবশেষে ১৮২৯ সালে রাজবিধি দ্বারা সহমরণ নিবারিত হইলে লর্ড উইলিয়ম্ বেন্টিঙ্ক্‌কে ধন্যবাদ করিয়া এক অভিনন্দনপত্র প্রেরণ করিলেন;

এবং সহমরণের পুনঃ প্রতিষ্ঠার পথ বন্ধ করিবার উদ্দেশে উক্ত আইনের বিরোধীদিগের আপত্তি খণ্ডন করিয়া এক পুস্তক প্রকাশ করিলেন। পরিশেষে পাছে তাঁহাদের প্রার্থনা ইংলণ্ডে গ্রাহ্য হয়, সে পথে বাধা দিবার জন্য, ঐ আইনপক্ষীয়দিগের এক ধন্যবাদ-পত্র পকেটে লইয়া ইংলণ্ডে যাত্রা করিলেন। কিছু করিতে অবশিষ্ট রাখিলেন না।

দ্বিতীয়তঃ, এদেশীয়দিগের উন্নতির জন্য পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রয়োজন—এই বিশ্বাস যখন জন্মিল, তখন ১৮১৬ সালে বন্ধুবর ডেভিড্ হেয়ারের সঙ্গে সম্মিলিত হইয়া, একটি উৎকৃষ্ট শ্রেণীর ইংরাজী স্কুল স্থাপনের আয়োজন করিলেন। ১৮১৭ সালে স্কুল স্থাপিত হইল বটে, কিন্তু নানা ঘটনাচক্রে তাহার পরিচালন কার্য্য তাঁহার হস্তের বাহিরে গেল; তিনি বাহিরে থাকিয়াও যথাসাধ্য সাহায্য করিতে লাগিলেন। তৎপরে যখন জানিলেন, ১৮১৭ সালে প্রতিষ্ঠিত স্কুলটির ফল আশানুরূপ হইতেছে না, তখন ১৮২২ সালে তিনি নিজের মনের মত ইংরাজী শিক্ষা দিবার জন্য একটি স্কুল স্থাপিত করিলেন এবং প্রধানতঃ নিজের ব্যয়ে চালাইতে লাগিলেন। ১৮২৩ সালে গভর্ণর-জেনারেল লর্ড আমৃহার্ষ্টের গবর্ণমেণ্ট একটি শিক্ষা কমিটি গঠিত করিয়া তাঁহাদের হস্তে, কলিকাতাতে একটি সংস্কৃত কলেজ স্থাপনপূর্ব্বক, প্রাচ্য শিক্ষা বিস্তারের ভার দিলেন। তখন রামমোহন রায় স্থির থাকিতে পারিলেন না। গবর্ণমেণ্টের প্রাচ্য নীতির ভ্রম প্রদর্শন করিয়া

ও ইংরাজী শিক্ষা বিস্তারের প্রয়োজনীয়তা প্রতিপন্ন করিয়া, গভর্ণর-জেনারেলকে এক পত্র লিখিলেন। এইরূপে তাঁহার সাধ্যে যতটুকু ছিল করিতে অবশিষ্ট রাখিলেন না।

ধর্ম্ম সংস্কারের চেষ্টাতে প্রবৃত্ত হইয়া কি করিয়াছিলেন তাহার ত কথাই নাই। ১৬ বৎসর বয়সের সময় যে পতাকা উড্ডীন করিলেন, মৃত্যুর দিন পর্য্যন্ত তাহা উড্ডীন রাখিতে ক্রুটি করেন নাই। ইহাকেই তাঁহার জীবনের সর্ব্বপ্রধান কার্য্য করিয়াছিলেন। ইহার জন্যই উপনিষদের অনুবাদ, ইহার জন্যই আত্মীয়-সভা স্থাপন, ইহার জন্যই বাইবেলের অনুবাদ, ইহার জন্যই খ্রীষ্টীয় পাদরীদিগের সহিত বাগ্-যুদ্ধ, ইহার জন্যই খ্রীষ্টীয়দিগের প্রতি নিবেদন, ইহার জন্যই ইউনিটেরিয়ান কমিটি সংগঠন, ইহার জন্যই এডাম্ সাহেবের উপাসনালয় স্থাপন, অবশেষে ইহার জন্যই ১৮২৮ সালে ব্রহ্মসভা স্থাপন, তাহার গৃহ নির্ম্মাণ, সেই গৃহ ট্রষ্টীহস্তে অর্পণ, ও ১৮৩০ সালের জানুয়ারী মাসে তাহাতে ব্রহ্মোপাসনার প্রতিষ্ঠা। কোনও কাজে হাত দিয়া তিনি আধখানা করিয়া ক্ষান্ত হন নাই।

তৎপরে, যেমন তাঁহার ঈশ্বরে অবিচলিত বিশ্বাস ছিল তেমনি মানবের প্রতি উদার প্রেম ছিল। বরং ইহা বলা যাইতে পারে যে, ঈশ্বর-প্রীতি অপেক্ষা মানব-প্রীতিই অধিক পরিমাণে তাঁহার কার্য্যের চালক ও পোষক ছিল। বর্ত্তমান সময়ে যত উদার তত্ত্ব মানব হৃদয়ে প্রতিভাত হইয়াছে,

তন্মধ্যে মানব জাতির একত্ব একটি অদ্ভুত তত্ত্ব। যতই বিভিন্ন জাতির ইতিবৃত্ত ও সাহিত্যাদি আলোচিত হইতেছে, যতই যাতায়াতের সুবিধা হইয়া বিভিন্ন দেশে ভ্রমণ ও বিভিন্ন জাতির সহিত সংমিশ্রণ বৃদ্ধি পাইতেছে, যতই বাণিজ্য সূত্রে জগতের জাতিসকল পরস্পরের সহিত স্বার্থ ও আত্মীয়তার বন্ধনে বদ্ধ হইতেছে, ততই এই তত্ত্বটি মানবচিত্তে জাগিয়া উঠিতেছে। জগতের জাতিসকল জানিতে পারিতেছেন, সমস্ত জগতের মানবকুল এক সূত্রে গ্রথিত। রামমোহন রায় আর এক দিক্ দিয়া এই তত্ত্বে উপনীত হইয়াছিলেন। তিনি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ধর্ম্মগ্রন্থ অনুশীলন করিয়া জানিয়াছিলেন যে, জগতের জাতিসকলের বিভিন্নতার মধ্যে প্রকৃতিগত একতা প্রচ্ছন্ন আছে, এবং বিধাতা সকল জাতির মধ্যে আপনাকে অভিব্যক্ত করিয়াছেন; তাঁহার অভিব্যক্তি কোনও এক বিশেষ জাতির মধ্যে আবদ্ধ নহে। এই উদার সার্ব্বভৌমিক ভাব হইতে তাঁহার উদার সার্ব্বজনীন প্রেম উৎপন্ন হইয়াছিল। তিনি স্বজাতি, স্বদেশ ও সমগ্র জগতের নরনারীর দুঃখ সহিতে পারেন নাই, সেইজন্য দুষ্কর নরসেবা ব্রতে আপনাকে নিয়োগ করিয়াছিলেন। ইহা হইতেই তাঁহার জীবনের একটী মূলমন্ত্র উঠিয়াছিল, সেটী এই— "The service of man is the service of God,— অর্থাৎ মানবের সেবাই ঈশ্বরের সেবা।" এইটী তাঁহার মুখে শুনা যাইত। তবে তাঁহার বিশেষত্ব এই ছিল যে,

তাঁহার মানব-প্রীতি অপরাপর অনেক মহাজনের মানব-প্রীতির ন্যায় সঙ্কীর্ণ আকার ধারণ করে নাই। তিনি যে সর্ব্বদেশের ও সকল জাতির নরনারীর দুঃখে দুঃখী হইতেন, সকল দেশের রাজনীতির প্রতি এত দৃষ্টি রাখিতেন, যে কোনও জাতির যে কোনও উন্নতির দ্বার উন্মুক্ত হইলে যে এত আনন্দিত হইতেন, তাহার ভিতরকার কথা এই ছিল যে, তাঁহার প্রেম সমগ্র জগতকে আলিঙ্গন করিয়াছিল। এই কারণেই তিনি এরূপ ধর্ম্মের অন্বেষণে বাহির হইয়াছিলেন যাহা সমগ্র জগতের সমুদয় মানব-সমাজকে একসূত্রে বাঁধিবে। এই সার্ব্বজনীন ও সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্মের চিন্তা নিরন্তর তাঁহার হৃদয়ে বাস করিত।

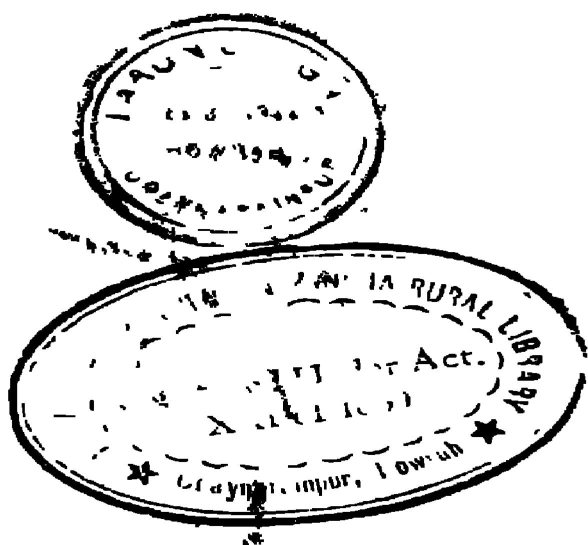
আমার বোধ হয়, এই স্বাভাবিক মানব-প্রেমের জন্যই তাঁহার সন্ন্যাস ধর্ম্মের প্রতি এত বিরাগ ছিল। তিনি ব্রহ্ম-জ্ঞানী হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু অদ্বৈতবাদী হন নাই। তিনি তাঁহার ধর্ম্মকে বেদান্ত প্রতিপাদ্য ধর্ম্ম বলিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাহাকে গৃহীর ধর্ম্ম করিয়া রাখিতে চাহিয়াছিলেন। তাঁহাতে ধর্ম্মসাধকের অস্বাভাবিকতা কিছুমাত্র ছিল না। সর্ব্বদা দেখিতে পাই, প্রচলিত ধর্ম্মের কোন কোন সাধক বিশেষতঃ ধর্ম্মপ্রচারকগণ, আপনাদিগকে ধার্ম্মিক দেখাইবার জন্য কতই ব্যগ্র হন। গৈরিক ধারণ করিয়া, মালা কমণ্ডলু লইয়া, গৃহ পরিবার ত্যাগ করিয়া, কতরূপে মানুষকে বলেন,—"তোমরা যেরূপ, আমরা সেরূপ নই; তোমরা সংসারী, আমরা

বিরাগী; তোমরা ভোগী, আমরা যোগী; তোমরা আসক্ত, আমরা ত্যাগী" ইত্যাদি। রামমোহন রায়ের মতি গতি যেন ঠিক্ ইহার বিপরীত ছিল। তিনি উপদেশ লিখিয়া অপরকে দিয়া পড়াইতেন; গ্রন্থ লিখিয়া কোনও শিষ্যকে পড়াইয়া তাহার নামে ছাপিতেন; একদিনও আচার্য্যের আসনে বসেন নাই; আহারে, ব্যবহারে, আলাপে, সামান্য মানবের ন্যায় থাকিতে প্রয়াস পাইতেন। ইংলণ্ড বাসকালে পদস্থ বন্ধুদিগের অনুরোধে রঙ্গভূমিতে নাট্যাভিনয় দেখিতে যাইতেন; সুপ্রসিদ্ধ অভিনেত্রী Fanny Kemble এর অভিনয়ে তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে কালিদাসের শকুন্তলার অনুবাদ ও আপনার প্রণীত ধর্ম্মগ্রন্থসকল উপহার দিয়াছিলেন। এক ইংরাজ দম্পতী তাঁহার নামে আপনাদের শিশু পুত্রের নামকরণ করিয়াছিলেন; রাজা শত প্রকার বড় বড় কার্য্যের ব্যস্ততার মধ্যেও সেই শিশু বন্ধুকে দেখিবার জন্য মধ্যে মধ্যে তাহার খেলার ঘরে গিয়া প্রবেশ করিতেন, এবং তাহার জননীকে আনন্দিত করিতেন। কলিকাতা বাসকালে বালক দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতিকে লইয়া গাছে দোলা টাঙ্গাইয়া তাঁহাদের সহিত দোল খাইতেন। এ সকল কেমন স্বাভাবিক! কেমন সুন্দর! কেমন মানবীয় ভাবসম্পন্ন! ইহার মধ্যে ধর্ম্ম সাধকের বিকৃত মুখভঙ্গী, বিরস ও তিক্ত বদন, নির্দ্দোষ আমোদের প্রতি ভ্রূকুটি, এ সকল কিছুই নাই। অপর দিকে মানব প্রেম হইতেই তাঁহার চিত্তে নারী জাতির প্রতি স্বাভাবিক প্রীতি ও

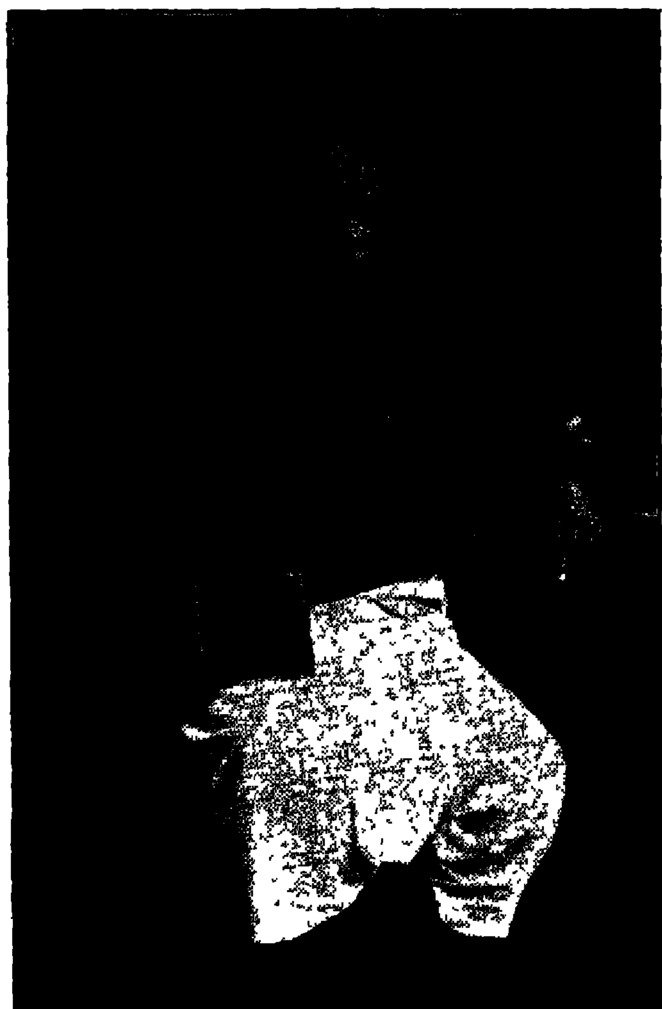
শ্রদ্ধা উঠিয়াছিল। সেই ধর্ম্মবীর ও কর্ম্মবীর নারীগণের সমক্ষে বালকের ন্যায় নম্র ও প্রেমে আর্দ্র হইতেন। যেখানেই যাইতেন স্ত্রীগণ তাঁহার পক্ষপাতিনী হইতেন। যৌবনের প্রারম্ভে তিব্বতের নারীগণ তাঁহার প্রাণ রক্ষা করিয়াছিলেন। শেষ দশায় মৃত্যুশয্যায়, একজন ইংরাজ রমণী, কুমারী হেয়ার, শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত কন্যার ন্যায়, তাঁহার শুশ্রূষা করিয়াছিলেন। প্রাণবায়ু যখন তাঁহার শ্রান্ত কলেবরকে পরিত্যাগ করিল, তখন ডাক্তার এস্‌লিন্ ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখেন, কুমারী হেয়ার অধীর হইয়া কাঁদিতেছেন। মানুষকে যিনি এত ভালবাসিতেন, মানুষ কেন তাঁহাকে ভালবাসিবে না? প্রেমে প্রেম চিনে, নারীহৃদয় স্বভাবতঃ প্রেমিক, সুতরাং নারীগণ প্রেমিক মানুষকে চিনিতে পারেন।

জীবনের মহালক্ষ্য সাধনের জন্য রামমোহন রায়ের ব্যগ্রতার কথা বলিয়াছি; সে বিষয়ে তাঁহার চিত্তের একাগ্রতার বিষয় এখনও বলিতে বাকী আছে। তাহা বলিয়াই প্রবন্ধের উপসংহার করিতেছি। সে কি একাগ্রতা! যে সময়ে তিনি জন্মিয়াছিলেন সে সময়ে সর্ব্ববিভাগে ভাঙ্গিয়া গড়িবার চেষ্টা চলিতেছিল। ইংরাজ রাজগণ তখন প্রায় সকল বিষয়েই অজ্ঞ ছিলেন, সুতরাং সর্ব্ববিভাগে সকল বিষয়ে তাঁহাদিগকে এদেশীয় চতুর সহকারীদের উপর নির্ভর করিতে হইত। এই কারণে সেই সময়ে চতুর মানুষের পক্ষে প্রভূত ধন উপার্জ্জনের দ্বার উন্মুক্ত ছিল। এই কারণে তৎকালে দেশীয় সমাজে

দেখিতে দেখিতে ক্রোড়পতি লক্ষপতি হওয়া একটা দৈনিক ঘটনার মধ্যে হইয়া উঠিয়াছিল; এবং ধনাগমের বাসনা প্রজ্বলিত অনলের ন্যায় শত শত হৃদয়ে জ্বলিতেছিল। বিষয় সম্পত্তি, বিষয় সম্পত্তি, ইহা লোকের ধ্যানে জ্ঞানে প্রবেশ করিয়াছিল। অতৃপ্ত ও অতর্পণীয় ভোগলালসা সর্ব্বত্র অনির্ব্বাণ অনলের ন্যায় বাড়িতেছিল। ইহার মধ্যে রামমোহন রায় দেখা দিলেন। তিনি ১৮০৩ সাল হইতে ১৮১৪ সাল পর্য্যন্ত ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের অধীনে বিষয় কার্য্য করিয়াছিলেন। বিষয় কার্য্যে থাকিয়াও অবসর কাল, তাঁহার জীবনের প্রধান কার্য্য যে ধর্ম্ম-সংস্কার, তাহারই চিন্তা ও আয়োজনে যাপন করিতেন। রঙ্গপুরের নানা সম্প্রদায়ের লোকের সহিত বিচার উপস্থিত করিয়া দেশব্যাপী আন্দোলন তুলিয়া দিলেন। ১৮১৪ সালে যেই ডিগ্‌বী সাহেব ছুটি লইয়া গেলেন, অমনি তিনিও চাকুরি ছাড়িলেন। কলিকাতাতে আসিয়া বসিয়া কি নিজের শ্রমোপার্জ্জিত অর্থ সুখে ভোগ করিতে পারিতেন না? তাহা করিলেন না। করিলেন কি, না বেদান্তের অনুবাদ, সত্য ধর্ম্মের প্রচার, সহমরণ নিবারণ প্রভৃতি কার্য্যে মুক্ত হস্তে সেই ধনের রাশি রাশি ব্যয়। কোন কোন গ্রন্থ তিনি তিন ভাষায় অনুবাদ করিয়া প্রচার করিয়াছেন। ১৮৩০ সালের মধ্যে তিনি এমনি নিঃস্ব হইয়া পড়িলেন যে, দিল্লীর সম্রাটের উকীল হইয়া ইউরোপে যাইতে হইল। ইংলণ্ডে



RURAL LIBRARY
Act.



ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

গিয়া তাঁহার গ্রন্থাবলী পুনর্মুদ্রিত করিতে ও এদেশীয় প্রজাদিগের স্বত্ব ও অধিকার রক্ষার জন্য গ্রন্থ মুদ্রিত করিতে একেবারে নির্ধন হইয়া পড়িলেন। কুমারী কলেট্ বলিয়াছেন, দারিদ্র্যের তাড়না তাঁহার অকাল মৃত্যুর অন্যতম কারণ। স্বকার্য্য সাধনে কি চিত্তের একাগ্রতা! কেবল তাহা নহে, শুনিলে কৌতুক বোধ হয়, তিনি রঙ্গভূমিতে, নৃত্যাগারে, সুহৃদ্-গোষ্ঠীতে যেখানে গিয়াছেন, লোকে দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছে যে, কিয়ৎক্ষণ পরেই অন্যমনস্ক হইয়া তিনি এক কোণে, কোনও বন্ধুর সহিত ধর্ম্মবিষয়ক প্রসঙ্গ ও বিচার উপস্থিত করিয়া তাহাতেই মগ্ন আছেন। স্বীয় লক্ষ্য সাধনে কি আবেশ। কি নেশা। সর্ব্বত্র একই চিন্তা, সর্ব্বত্র একই প্রধান প্রসঙ্গ, সর্ব্বত্র একই প্রধান আলোচনা,—তাহা মানবের ধর্ম্মভাবের ও ধর্ম্ম জীবনের উন্নতি।

বিদ্যাসাগর

বিদ্যাসাগরের চরিত্রে যাহা সর্ব্বপ্রধান গুণ—যে গুণে তিনি পল্লী-আচারের ক্ষুদ্রতা, বাঙালী-জীবনের জড়ত্ব, সবলে ভেদ করিয়া, একমাত্র নিজের গতি-বেগ-প্রাবল্যে কঠিন প্রতিকূলতার বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া—হিন্দুত্বের দিকে নহে, সাম্প্রদায়িকতার দিকে নহে—করুণার অশ্রুজলপূর্ণ উন্মুক্ত

অপার মনুষ্যত্বের অভিমুখে আপনার দৃঢ়নিষ্ঠ একাগ্র একক জীবনকে প্রবাহিত করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন, আমি যদি তাঁহার সেই গুণকীর্ত্তন করিতে বিরত হই, তবে আমার কর্ত্তব্য একেবারেই অসম্পন্ন থাকিয়া যায়। কারণ, বিদ্যাসাগরের জীবনবৃত্তান্ত আলোচনা করিয়া দেখিলে এই কথাটি বারংবার মনে উদয় হয় যে, তিনি যে বাঙালী বড়লোক ছিলেন, তাহা নহে; তিনি যে রীতিমত হিন্দু ছিলেন, তাহাও নহে;—তিনি তাহা অপেক্ষাও অনেক বেশী বড় ছিলেন, তিনি যথার্থ মানুষ ছিলেন। বিদ্যাসাগরের জীবনীতে এই অনন্যসুলভ মনুষ্যত্বের প্রাচুর্য্যই সর্ব্বোচ্চ গৌরবের বিষয়। তাঁহার সেই পর্ব্বতপ্রমাণ চরিত্রমাহাত্ম্য তাঁহারই কৃতকীর্ত্তিকেও খর্ব্ব করিয়া রাখিয়াছে।

তাঁহার প্রধান কীর্ত্তি বঙ্গভাষা। যদি এই ভাষা কখন সাহিত্যসম্পদে ঐশ্বর্য্যশালিনী হইয়া উঠে, যদি এই ভাষা অক্ষয় ভাবজননীরূপে মানবসভ্যতার ধাত্রীগণের ও মাতৃগণের মধ্যে গণ্য হয়, যদি এই ভাষা পৃথিবীর শোকদুঃখের মধ্যে এক নূতন সান্ত্বনাস্থল—সংসারের তুচ্ছতা ও ক্ষুদ্র স্বার্থের মধ্যে এক মহত্ত্বের আদর্শলোক, দৈনন্দিন মানবজীবনের অবসাদ ও অস্বাস্থ্যের মধ্যে সৌন্দর্য্যের এক নিভৃত নিকুঞ্জবন রচনা করিতে পারে, তবেই তাঁহার এই কীর্ত্তি তাঁহার উপযুক্ত গৌরব লাভ করিতে পারিবে।

বাংলাভাষার বিকাশে বিদ্যাসাগরের প্রভাব কিরূপ

কার্য্য করিয়াছে, এখানে তাহা স্পষ্ট করিয়া নির্দ্দেশ করা আবশ্যক।

বিদ্যাসাগর বাংলাভাষার প্রথম যথার্থ শিল্পী ছিলেন। তৎপূর্ব্বে বাংলায় গদ্যসাহিত্যের সূচনা হইয়াছিল, কিন্তু তিনিই সর্ব্বপ্রথমে বাংলাগদ্যে কলানৈপুণ্যের অবতারণা করেন। ভাষা যে কেবল ভাবের একটা আধারমাত্র নহে, তাহার মধ্যে যেন-তেন-প্রকারেণ কতকগুলা বক্তব্যবিষয় পূরিয়া দিলেই যে কর্ত্তব্য সমাপন হয় না, বিদ্যাসাগর দৃষ্টান্ত-দ্বারা তাহাই প্রমাণ করিয়াছিলেন। তিনি দেখাইয়াছিলেন যে, যতটুকু বক্তব্য, তাহা সরল করিয়া, সুন্দর করিয়া এবং সুশৃঙ্খল করিয়া ব্যক্ত করিতে হইবে। আজিকার দিনে এ কাজটিকে তেমন বৃহৎ বলিয়া মনে হইবে না, কিন্তু সমাজ-বন্ধন যেমন মনুষ্যত্ব-বিকাশের পক্ষে অত্যাবশ্যক, তেম্‌নি ভাষাকে কলাবন্ধনের দ্বারা সুন্দররূপে সংযমিত না করিলে, সে ভাষা হইতে কদাচ প্রকৃত সাহিত্যের উদ্ভব হইতে পারে না। সৈন্যদলের দ্বারা যুদ্ধ সম্ভব, কেবলমাত্র জনতার দ্বারা নহে,—জনতা নিজেকেই নিজে খণ্ডিত-প্রতিহত করিতে থাকে, তাহাকে চালনা করাই কঠিন। বিদ্যাসাগর বাংলা গদ্যভাষার উচ্ছৃঙ্খল জনতাকে সুবিভক্ত, সুবিন্যস্ত, সুপরিচ্ছন্ন এবং সুসংযত করিয়া তাহাকে সহজ গতি এবং কার্য্যকুশলতা দান করিয়াছেন—এখন তাহার দ্বারা অনেক সেনাপতি ভাবপ্রকাশের কঠিন বাধাসকল পরাহত করিয়া সাহিত্যের

নব নব ক্ষেত্র আবিষ্কার ও অধিকার করিয়া লইতে পারেন—কিন্তু যিনি এই সেনানীর রচনাকর্তা, যুদ্ধজয়ের যশোভাগ সর্ব্বপ্রথমে তাঁহাকেই দিতে হয়।

বাংলাভাষাকে পূর্ব্বপ্রচলিত অনাবশ্যক সমাসাড়ম্বরভার হইতে মুক্ত করিয়া, তাহার পদগুলির মধ্যে অংশযোজনার সুনিয়ম স্থাপন করিয়া, বিদ্যাসাগর যে বাংলাগদ্যকে কেবল-মাত্র সর্ব্বপ্রকার ব্যবহারযোগ্য করিয়াই ক্ষান্ত ছিলেন, তাহা নহে, তিনি তাহাকে শোভন করিবার জন্যও সর্ব্বদা সচেষ্ট ছিলেন। গদ্যের পদগুলির মধ্যে একটা ধ্বনিসামঞ্জস্য স্থাপন করিয়া, তাহার গতির মধ্যে একটি অনতিলক্ষ্য ছন্দঃস্রোত রক্ষা করিয়া, সৌম্য এবং সরল শব্দগুলি নির্ব্বাচন করিয়া বিদ্যাসাগর বাংলাগদ্যকে সৌন্দর্য্য ও পরিপূর্ণতা দান করিয়াছেন। গ্রাম্যপাণ্ডিত্য এবং গ্রাম্যবর্ব্বরতা, উভয়ের হস্ত হইতেই উদ্ধার করিয়া তিনি ইহাকে পৃথিবীর ভদ্রসভার উপযোগী আর্য্যভাষারূপে গঠিত করিয়া গিয়াছেন। তৎপূর্ব্বে বাংলাগদ্যের যে অবস্থা ছিল, তাহা আলোচনা করিয়া দেখিলে এই ভাষাগঠনে বিদ্যাসাগরের শিল্পপ্রতিভা ও সৃষ্টি-ক্ষমতার প্রচুর পরিচয় পাওয়া যায়।

কিন্তু প্রতিভাসম্পন্ন বলিয়া বিদ্যাসাগরের সম্মান নহে। বিশেষতঃ বিদ্যাসাগর যাহার উপর আপন প্রতিভা প্রয়োগ করিয়াছিলেন, তাহা প্রবহমাণ,—পরিবর্ত্তনশীল। ভাষা নদীস্রোতের মত—তাহার উপরে কাহারো নাম খুদিয়া রাখা

যায় না। মনে হয়, যেন সে চিরকাল এবং সর্ব্বত্র স্বভাবতঃই এইভাবে প্রবাহিত হইয়া আসিতেছে। বাস্তবিক সে যে কোন্ কোন্ নির্ঝরধারায় গঠিত ও পরিপুষ্ট, তাহা নির্ণয় করিতে হইলে উজানমুখে গিয়া পুরাবৃত্তের দুর্গম গিরিশিখরে অরোহণ করিতে হয়। বিশেষ গ্রন্থ অথবা চিত্র অথবা মূর্ত্তি চিরকাল আপনার স্বাতন্ত্র্যরক্ষা করিয়া আপন রচনাকর্ত্তাকে স্মরণ করাইয়া দেয়, কিন্তু ভাষা ছোট-বড অসংখ্য লোকের নিকট হইতে জীবনলাভ করিতে করিতে ব্যাপ্ত হইয়া পূর্ব্ব ইতিহাস বিস্মৃত হইয়া চলিয়া যায়, বিশেষরূপে কাহারো নাম ঘোষণা করে না।

কিন্তু সেজন্য আক্ষেপ করিবার প্রয়োজন নাই; কারণ, বিদ্যাসাগরের গৌরব কেবলমাত্র তাঁহার প্রতিভার উপর নির্ভর করিতেছে না।

প্রতিভা মানুষের সমস্তটা নহে, তাহা মানুষের একাংশমাত্র। প্রতিভা মেঘের মধ্যে বিদ্যুতের মত, আর মনুষ্যত্ব চরিত্রের দিবালোক, তাহা সর্ব্বত্রব্যাপী ও স্থির। প্রতিভা মানুষের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অংশ—আর, মনুষ্যত্ব জীবনের সকল মুহূর্ত্তেই সকল কার্য্যেই আপনাকে ব্যক্ত করিতে থাকে। প্রতিভা অনেক সময়ে বিদ্যুতের ন্যায় আপনার আংশিকতাবশতঃই লোকচক্ষে তীব্রতররূপে আঘাত করে এবং চরিত্রমহত্ত্ব আপনার ব্যাপকতাগুণেই প্রতিভা অপেক্ষা ম্লানতর বলিয়া প্রতীয়মান হয়। কিন্তু চরিত্রের শ্রেষ্ঠতাই যে যথার্থ শ্রেষ্ঠতা,

ভাবিয়া দেখিলে সে বিষয়ে কাহারো সংশয় থাকিতে পারে না।

ভাষা, প্রস্তর অথবা চিত্রপটের দ্বারা সত্য এবং সৌন্দর্য্য প্রকাশ করা ক্ষমতার কার্য্য, সন্দেহ নাই, তাহাতে বিচিত্র বাধা অতিক্রম এবং অসামান্য নৈপুণ্য প্রয়োগ করিতে হয়। কিন্তু নিজের সমগ্র জীবনের দ্বারা সেই সত্য ও সৌন্দর্য্য প্রকাশ করা তদপেক্ষা আরো বেশী দুরূহ, তাহাতে পদে পদে কঠিনতর বাধা অতিক্রম করিতে হয় এবং তাহাতে স্বাভাবিক সূক্ষ্ম বোধশক্তি ও নৈপুণ্য, সংযম ও বল অধিকতর আবশ্যক হয়।

এই চরিত্ররচনার প্রতিভা কোনো সাম্প্রদায়িক শাস্ত্র মানিয়া চলে না। প্রকৃত কবির কবিত্ব যেমন অলঙ্কারশাস্ত্রের অতীত, অথচ বিশ্বহৃদয়ের মধ্যে বিধিরচিত নিগূঢ়নিহিত এক অলিখিত অলঙ্কারশাস্ত্রের কোন নিয়মের সহিত তাহার স্বভাবতঃ কোন বিরোধ হয় না, তেম্‌নি যাঁহারা যথার্থ মনুষ্য, তাঁহাদের শাস্ত্র তাঁহাদের অন্তরের মধ্যে, অথচ বিশ্বব্যাপী মনুষ্যত্বের সমস্ত নিত্যবিধানগুলির সঙ্গে সে শাস্ত্র আপনি মিলিয়া যায়। অতএব, অন্যান্য প্রতিভায় যেমন "ওরিজিন্যালিটি" অর্থাৎ অনন্যতন্ত্রতা প্রকাশ পায়, মহচ্চরিত্র-বিকাশেও সেইরূপ অনন্যতন্ত্রতার প্রয়োজন হয়।—অনেকে বিদ্যাসাগরের অনন্যতন্ত্র প্রতিভা ছিল না বলিয়া আভাস দিয়া থাকেন; তাঁহারা জানেন, অনন্যতন্ত্রত্ব কেবল সাহিত্যে

এবং শিল্পে, বিজ্ঞানে এবং দর্শনেই প্রকাশ পাইয়া থাকে। বিদ্যাসাগর এই অকৃতকীর্ত্তি অকিঞ্চিৎকর বঙ্গসমাজের মধ্যে নিজের চরিত্রকে মনুষ্যত্বের আদর্শরূপে প্রস্ফুট করিয়া যে এক অসামান্য অনন্যতন্ত্রত্ব প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা বাংলার ইতিহাসে অতিশয় বিরল। এত বিরল যে, এক শতাব্দীর মধ্যে কেবল আর দুইএক জনের নাম মনে পড়ে এবং তাঁহাদের মধ্যে রামমোহন রায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

অনন্যতন্ত্রতা শব্দটা শুনিবামাত্র তাহাকে সঙ্কীর্ণতা বলিয়া ভ্রম হইতে পারে; মনে হইতে পারে, তাহা ব্যক্তিগত বিশেষত্ব, সাধারণের সহিত তাহার যোগ নাই। কিন্তু সে কথা যথার্থ নহে। বস্তুতঃ আমরা নিয়মের শৃঙ্খলে, জটিল কৃত্রিমতার বন্ধনে এতই জড়িত ও আচ্ছন্ন হইয়া থাকি যে, আমরা সমাজের কল-চালিত পুত্তলের মত হইয়া যাই; অধিকাংশ কাজই সংস্কারাধীনে অন্ধভাবে সম্পন্ন করি; নিজত্ব কাহাকে বলে, জানি না, জানিবার আবশ্যকতা রাখি না। আমাদের ভিতরকার আসল মানুষটি জন্মাবধি মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত প্রায় সুপ্তভাবেই কাটাইয়া দেয়, তাহার স্থানে কাজ করে একটা নিয়ম-বাঁধা যন্ত্র। যাঁহাদের মধ্যে মনুষ্যত্বের পরিমাণ অধিক, চিরাগত প্রথা ও অভ্যাসের জড় আচ্ছাদনে তাঁহাদের সেই প্রবল শক্তিকে চাপা দিয়া রাখিতে পারে না। ইঁহারাই নিজের চরিত্রপুরীর মধ্যে স্বায়ত্তশাসনের অধিকার প্রাপ্ত হন। অন্তরস্থ মনুষ্যত্বের এই স্বাধীনতার নামই

নিজস্ব। এই নিজস্ব ব্যক্তভাবে ব্যক্তিবিশেষের, কিন্তু নিগূঢ়-ভাবে সমস্ত মানবের। মহৎ ব্যক্তিরা এই নিজস্বপ্রভাবে একদিকে স্বতন্ত্র,—একক, অন্যদিকে সমস্ত মানবজাতির সবর্ণ,—সহোদর। আমাদের দেশে রামমোহন রায় এবং বিদ্যাসাগর উভয়ের জীবনেই ইহার পরিচয় পাওয়া যায়। একদিকে যেমন তাঁহারা ভারতবর্ষীয়, তেম্নি অপরদিকে য়ুরোপীয় প্রকৃতির সহিত তাঁহাদের চরিত্রের বিস্তর নিকট সাদৃশ্য দেখিতে পাই। অথচ তাহা অনুকরণগত সাদৃশ্য নহে। বেশভূষায়, আচার-ব্যবহারে তাঁহারা সম্পূর্ণ বাঙালী ছিলেন; স্বজাতীয় শাস্ত্রজ্ঞানে তাঁহাদের সমতুল্য কেহ ছিল না; স্বজাতিকে মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের মূলপত্তন তাঁহারাই করিয়া গিয়াছেন—অথচ নির্ভীক বলিষ্ঠতা, সত্যচারিতা, লোকহিতৈষা, দৃঢ়প্রতিজ্ঞা এবং আত্মনির্ভরতায় তাঁহারা বিশেষরূপে য়ুরোপীয় মহাজনদের সহিত তুলনীয় ছিলেন। য়ুরোপীয়দের তুচ্ছ বাহ্য অনুকরণের প্রতি তাঁহারা যে অবজ্ঞাপ্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতেও তাঁহাদের য়ুরোপীয়-সুলভ গভীর আত্মসম্মানবোধের পরিচয় পাওয়া যায়। য়ুরোপীয় কেন, সরল সত্যপ্রিয় সাঁওতালেরাও যে অংশে মনুষ্যত্বে ভূষিত, সেই অংশে বিদ্যাসাগর তাঁহার স্বজাতীয় বাঙালীর অপেক্ষা সাঁওতালের সহিত আপনার অন্তরের যথার্থ ঐক্য অনুভব করিতেন।

মাঝে মাঝে বিধাতার নিয়মের এরূপ আশ্চর্য্য ব্যতিক্রম

হয় কেন, বিশ্বকর্ম্মা যেখানে চারকোটি বাঙালী নির্ম্মাণ করিতেছিলেন, সেখানে হঠাৎ দুই একজন মানুষ গড়িয়া বসেন কেন, তাহা বলা কঠিন। কি নিয়মে বড়লোকের অভ্যুত্থান হয়, তাহা সকল দেশেই রহস্যময়—আমাদের এই ক্ষুদ্রকর্ম্মা ভীরুহৃদয়ের দেশে সে রহস্য দ্বিগুণতর দুর্ভেদ্য। বিদ্যাসাগরের চরিত্রসৃষ্টিও রহস্যাবৃত—কিন্তু ইহা দেখা যায়, সে চরিত্রের ছাঁচ ছিল ভাল। ঈশ্বরচন্দ্রের পূর্ব্বপুরুষের মধ্যে মহত্ত্বের উপকরণ প্রচুরপরিমাণে সঞ্চিত ছিল।

বিদ্যাসাগরের জীবনবৃত্তান্ত আলোচনা করিলে প্রথমেই তাঁহার পিতামহ রামজয় তর্কভূষণ আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। লোকটি অনন্যসাধারণ ছিলেন, তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই।

মেদিনীপুর জেলায় বনমালিপুরে তাঁহার পৈতৃক বাসস্থান ছিল। তাঁহার পিতার মৃত্যুর পরে বিষয়বিভাগ লইয়া সহোদরদের সহিত মনান্তর হওয়ায় তিনি সংসারত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছিলেন। বহুকাল পরে তর্কভূষণ দেশে ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন, তাঁহার স্ত্রী দুর্গাদেবী ভাশুর ও দেবরগণের অনাদরে প্রথমে শ্বশুরালয় হইতে বীরসিংহগ্রামে পিত্রালয়ে, পরে সেখানেও ভ্রাতা ও ভ্রাতৃজায়ার লাঞ্ছনায় বৃদ্ধপিতার সাহায্যে পিতৃভবনের অনতিদূরে এক কুটীরে বাস করিয়া, চরকা কাটিয়া দুই পুত্র ও চারি কন্যা সহ বহুকষ্টে দিনপাত করিতেছেন। তর্কভূষণ ভ্রাতাদের আচরণ শুনিয়া নিজের

স্বত্ব ও তাঁহাদের সংস্রব ত্যাগ করিয়া ভিন্নগ্রামে দারিদ্র্য অবলম্বন করিয়া রহিলেন। কিন্তু যাঁহার স্বভাবের মধ্যে মহত্ত্ব আছে, দারিদ্র্যে তাঁহাকে দরিদ্র করিতে পারে না। বিদ্যাসাগর স্বয়ং তাঁহার পিতামহের যে চরিত্র বর্ণনা করিয়াছেন, স্থানে স্থানে তাহা উদ্ধৃত করিতে ইচ্ছা করি।

"তিনি নিরতিশয় তেজস্বী ছিলেন; কোন অংশে কাহারও নিকট অবনত হইয়া চলিতে, অথবা কোনপ্রকারে অনাদর বা অবমাননা সহ্য করিতে পারিতেন না। তিনি সকল স্থলে, সকল বিষয়ে, স্বীয় অভিপ্রায়ের অনুবর্ত্তী হইয়া চলিতেন, অন্যদীয় অভিপ্রায়ের অনুবর্ত্তন, তদীয় স্বভাব ও অভ্যাসের সম্পূর্ণ বিপরীত ছিল। উপকারপ্রত্যাশায়, অথবা অন্য কোনও কারণে, তিনি কখনও পরের উপাসনা বা আনুগত্য করিতে পারেন নাই।" *

ইহা হইতেই বুঝিতে পারা যাইতেছে, একান্নবর্ত্তী পরিবারে কেন এই অগ্নিখণ্ডটিকে ধরিয়া রাখিতে পারে নাই। তাঁহারা পাঁচ সহোদর ছিলেন, কিন্তু তিনি একাই নীহারিকাচক্র হইতে বিচ্ছিন্ন জ্যোতিষ্কের মত আপন বেগে বাহিরে বিক্ষিপ্ত হইয়াছিলেন। একান্নবর্ত্তী পরিবারের বহুভারাক্রান্ত যন্ত্রেও তাঁহার কঠিন চরিত্রস্বাতন্ত্র্য পেষণ করিয়া দিতে পারে নাই।

"তাঁহার শ্যালক রামসুন্দর বিদ্যাভূষণ গ্রামের প্রধান

* স্বরচিত বিদ্যাসাগরচরিত; ৩১ পৃষ্ঠা।

বলিয়া পরিগণিত এবং সাতিশয় গর্ব্বিত ও উদ্ধতস্বভাব ছিলেন। তিনি মনে করিয়াছিলেন, ভগিনীপতি রামজয় তাঁহার অনুগত হইয়া থাকিবেন। কিন্তু, তাঁহার ভগিনীপতি কিরূপ প্রকৃতির লোক, তাহা বুঝিতে পারিলে, তিনি সেরূপ মনে করিতে পারিতেন না। রামজয় রামসুন্দরের অনুগত হইয়া না চলিলে, রামসুন্দর নানাপ্রকারে তাঁহাকে জব্দ করিবেন, অনেকে তাঁহাকে এই ভয় দেখাইয়াছিলেন। কিন্তু রামজয়, কোনও কারণে, ভয় পাইবার লোক ছিলেন না; তিনি স্পষ্টবাক্যে বলিতেন, বরং বাসত্যাগ করিব, তথাপি শালার অনুগত হইয়া চলিতে পারিব না। শ্যালকের আক্রোশে, তাঁহাকে সময়ে সময়ে প্রকৃতপ্রস্তাবে, এক-ঘরিয়া হইয়া থাকিতে ও নানাপ্রকার অত্যাচার-উপদ্রব সহ্য করিতে হইত; তিনি তাহাতে ক্ষুব্ধ বা চলচিত্ত হইতেন না।" *

তাঁহার তেজস্বিতার উদাহরণস্বরূপে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, জমিদার যখন তাঁহাদের বীরসিংহগ্রামের নূতন বাস্তবাটী নিষ্কর ব্রহ্মোত্তর করিয়া দিবেন মানস করিয়াছিলেন, তখন রামজয় দানগ্রহণ করিতে সম্মত হন নাই। গ্রামের অনেকেই বসতবাটী নাখেরাজ করিবার জন্য তাঁহাকে অনেক উপদেশ দিয়াছিল, কিন্তু তিনি কাহারও অনুরোধ রক্ষা করেন নাই। এমন লোকের পক্ষে দারিদ্র্যও মহৈশ্বর্য্য,

* স্বরচিত বিদ্যাসাগরচরিত, ৩০ পৃষ্ঠা।

ইহাতে তাঁহার স্বাভাবিক সম্পদ্ জাজ্বল্যমান করিয়া তোলে। *

কিন্তু তর্কভূষণ যে আপন স্বাতন্ত্র্যগর্ব্বে সর্ব্বসাধারণকে অবজ্ঞা করিয়া দূরে থাকিতেন, তাহা নহে। বিদ্যাসাগর বলেন, "তর্কভূষণমহাশয় নিরতিশয় অমায়িক ও নিরহঙ্কার ছিলেন; কি ছোট, কি বড়, সর্ব্ববিধ লোকের সহিত, সমভাবে সদয় ও সাদর ব্যবহার করিতেন। তিনি যাঁহাদিগকে কপটাচারী মনে করিতেন, তাঁহাদের সহিত সাধ্যপক্ষে আলাপ করিতেন না। তিনি স্পষ্টবাদী ছিলেন, কেহ রুষ্ট বা অসন্তুষ্ট হইবেন, ইহা ভাবিয়া, স্পষ্টকথা বলিতে ভীত বা সঙ্কুচিত হইতেন না। তিনি যেমন স্পষ্টবাদী, তেমনই যথার্থবাদী ছিলেন। কাহারও ভয়ে বা অনুরোধে, অথবা অন্য কোনও কারণে, তিনি কখনও কোনও বিষয়ে অযথা নির্দ্দেশ করেন নাই। তিনি যাঁহাদিগকে আচরণে ভদ্র দেখিতেন, তাঁহাদিগকেই ভদ্র বলিয়া গণ্য করিতেন, আর যাঁহাদিগকে আচরণে অভদ্র দেখিতেন, বিদ্বান্, ধনবান্ ও ক্ষমতাপন্ন হইলেও, তাঁহাদিগকে ভদ্রলোক বলিয়া জ্ঞান করিতেন না।" †

এদিকে তর্কভূষণমহাশয়ের বল এবং সাহসও আশ্চর্য্য ছিল। সর্ব্বদাই তাঁহার হস্তে একখানি লৌহদণ্ড থাকিত।

---

* সহোদর শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন প্রণীত বিদ্যাসাগরজীবনচরিত, ৫ পৃষ্ঠা।

† স্বরচিত বিদ্যাসাগরচরিত, ৩২ পৃষ্ঠা।

তখন দস্যুভয়ে অনেকে একত্র না হইয়া স্থানান্তরে যাইতে পারিত না, কিন্তু তিনি একা এই লৌহদণ্ডহস্তে অকুতোভয়ে সর্ব্বত্র যাতায়াত করিতেন ; এমন কি, দুইচারিবার আক্রান্ত হইয়া দস্যুদিগকে উপযুক্তরূপ শিক্ষা দিয়াছিলেন। একুশ-বৎসর বয়সে একবার তিনি এক ভালুকের সম্মুখে পড়িয়া-ছিলেন। "ভালুক নখরপ্রহারে তাঁহার সর্ব্বশরীর ক্ষতবিক্ষত করিতে লাগিল, তিনিও অবিশ্রান্ত লৌহযষ্টি প্রহার করিতে লাগিলেন। ভালুক ক্রমে নিস্তেজ হইয়া পড়িলে, তিনি, তদীয় উদরে উপর্য্যুপরি পদাঘাত করিয়া, তাহার প্রাণসংহার করিলেন।" † অবশেষে শোণিতাক্ত বিক্ষতদেহে চারিক্রোশ পথ হাঁটিয়া মেদিনীপুরে এক আত্মীয়ের গৃহে শয্যা আশ্রয় করেন ;—দুইমাস পরে সুস্থ হইয়া বাড়ী ফিরিতে পারেন।

আর একটিমাত্র ঘটনা উল্লেখ করিলে তর্কভূষণের চরিত্র-চিত্র সম্পূর্ণ হইবে।

১৭৪২ শকের ১২ই আশ্বিন মঙ্গলবারে বিদ্যাসাগরের পিতা ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় অদূরে কোমরগঞ্জে মধ্যাহ্নে হাট করিতে গিয়াছিলেন। রামজয় তর্কভূষণ তাঁহাকে ঘরের একটি শুভসংবাদ দিতে বাহির হইয়াছিলেন। পথের মধ্যে পুত্রের সহিত দেখা হইলে বলিলেন, "একটি এঁড়ে-বাছুর হয়েছে।" শুনিয়া ঠাকুরদাস ঘরে আসিয়া গোয়ালের অভিমুখে গমন করিতেছিলেন ; তর্কভূষণ হাসিয়া কহিলেন,

† স্বরচিত বিদ্যাসাগরচরিত।

"ওদিকে নয়, এদিকে এস"—বলিয়া সূতিকাগৃহে লইয়া নবপ্রসূত শিশু ঈশ্বরচন্দ্রকে নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইলেন।

এই কৌতুকহাস্যরশ্মিপাতে রামজয়ের বলিষ্ঠ উন্নতচরিত্র আমাদের নিকট প্রভাতের গিরিশিখরের ন্যায় রমণীয় বোধ হইতেছে। এই হাস্যময় তেজোময় নির্ভীক ঋজুস্বভাব পুরুষের মত আদর্শ বাংলাদেশে অত্যন্ত বিরল না হইলে বাঙালির মধ্যে পৌরুষের অভাব হইত না। আমরা তাঁহার চরিত্রবর্ণনা বিস্তারিতরূপে উদ্ধৃত করিলাম, তাহার কারণ, এই দরিদ্র ব্রাহ্মণ তাঁহার পৌত্রকে আর কোন সম্পত্তি দান করিতে পারেন নাই, কেবল যে অক্ষয়সম্পদের উত্তরাধিকার-বণ্টন একমাত্র ভগবানের হস্তে, সেই চরিত্রমাহাত্ম্য অখণ্ডভাবে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পৌত্রের অংশে রাখিয়া গিয়াছিলেন।

পিতা ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ও সাধারণ লোক ছিলেন না। যখন তাঁহার বয়স ১৪।১৫ বৎসর, এবং যখন তাঁহার মাতা দুর্গাদেবী চরকায় সূতা কাটিয়া একাকিনী তাঁহার দুই পুত্র এবং চারি কন্যার ভরণপোষণে প্রবৃত্ত ছিলেন, তখন ঠাকুরদাস উপার্জ্জনের চেষ্টায় কলিকাতায় প্রস্থান করিলেন।

কলিকাতায় আসিয়া প্রথমে তিনি তাঁহার আত্মীয় জগন্মোহন তর্কালঙ্কারের বাড়ীতে উঠিলেন। ইংরাজি শিখিলে সওদাগর সাহেবদের হৌসে কাজ জুটিতে পারিবে জানিয়া, প্রত্যহ সন্ধ্যাবেলায় এক শিপ্-সরকারের বাড়ী ইংরাজি শিখিতে যাইতেন। যখন বাড়ী ফিরিতেন, তখন

তর্কালঙ্কারের বাড়ীতে উপরিলোকের আহারের কাণ্ড শেষ হইয়া যাইত, সুতরাং তাঁহাকে রাত্রে অনাহারে থাকিতে হইত। অবশেষে তিনি তাঁহার শিক্ষকের এক আত্মীয়ের বাড়ী আশ্রয় লইলেন। আশ্রয়দাতার দারিদ্র্যনিবন্ধন এক একদিন তাঁহাকে সমস্তদিন উপবাসী থাকিতে হইত। একদিন ক্ষুধার জ্বালায় তাঁহার যথাসর্ব্বস্ব একখানি পিতলের থালা ও একটি ছোট ঘটি কাঁসারির দোকানে বেচিতে গিয়াছিলেন। কাঁসারিরা তাহার পাঁচসিকা দর স্থির করিয়াছিল, কিন্তু কিনিতে সম্মত হইল না; বলিল, অজানিত লোকের নিকট হইতে পুরাণ বাসন কিনিয়া মাঝে মাঝে বড় ফেসাদে পড়িতে হয়। * ৮

আর একদিন ক্ষুধার যন্ত্রণা ভুলিবার অভিপ্রায়ে মধ্যাহ্নে ঠাকুরদাস বাসা হইতে বাহির হইয়া পথে পথে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। "বড়বাজার হইতে ঠন্ঠনিয়া পর্য্যন্ত গিয়া এত অভিভূত হইলেন যে, আর তাঁহার চলিবার ক্ষমতা রহিল না। কিঞ্চিৎ পরেই তিনি এক দোকানের সম্মুখে উপস্থিত ও দণ্ডায়মান হইলেন; দেখিলেন, এক মধ্যবয়স্কা বিধবা নারী ঐ দোকানে বসিয়া মুড়িমুড়্কি বেচিতেছেন। তাঁহাকে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া, ঐ স্ত্রীলোক জিজ্ঞাসা করিলেন, বাবাঠাকুর, দাঁড়াইয়া আছ কেন? ঠাকুরদাস তৃষ্ণার উল্লেখ করিয়া, পানার্থে জল প্রার্থনা করিলেন। তিনি, সাদর ও

* সহোদর শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন প্রণীত বিদ্যাসাগরজীবনচরিত।

সস্নেহবাক্যে, ঠাকুরদাসকে বসিতে বলিলেন, এবং ব্রাহ্মণের ছেলেকে শুধু জল দেওয়া অবিধেয়, এই বিবেচনা করিয়া, কিছু মুড়্কি ও জল দিলেন। ঠাকুরদাস, যেরূপ ব্যগ্র হইয়া, মুড়্কিগুলি খাইলেন, তাহা একদৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিয়া, ঐ স্ত্রীলোক জিজ্ঞাসা করিলেন, বাবাঠাকুর, আজ বুঝি তোমার খাওয়া হয় নাই ? তিনি বলিলেন, না মা, আজ আমি, এখন পর্য্যন্ত কিছু খাই নাই। তখন সেই স্ত্রীলোক ঠাকুরদাসকে বলিলেন, বাবাঠাকুর, জল খাইয়ো না, একটু অপেক্ষা কর। এই বলিয়া নিকটবর্ত্তী গোয়ালার দোকান হইতে, সত্বর দই কিনিয়া আনিলেন, এবং আরও মুড়্কি দিয়া, ঠাকুরদাসকে পেট ভরিয়া ফলার করাইলেন ; পরে তাঁহার মুখে সমস্ত অবগত হইয়া, জিদ্ করিয়া বলিয়া দিলেন, যেদিন তোমার এরূপ ঘটিবে, এখানে আসিয়া ফলার করিয়া যাইবে।" *

এইরূপ কষ্টে কিছু ইংরাজি শিখিয়া ঠাকুরদাস প্রথমে মাসিক দুই টাকা ও তাহার দুই তিন বৎসর পরে মাসিক পাঁচটাকা বেতন উপার্জ্জন করিতে লাগিলেন। অবশেষে জননী দুর্গাদেবী যখন শুনিলেন, তাঁহার ঠাকুরদাসের মাসিক আট টাকা মাহিয়ানা হইয়াছে, তখন তাঁহার আহ্লাদের সীমা রহিল না এবং ঠাকুরদাসের সেই তেইশ চব্বিশ বৎসর বয়সে গোঘাটনিবাসী রামকান্ত তর্কবাগীশের দ্বিতীয়া কন্যা ভগবতী দেবীর সহিত তাঁহার বিবাহ দিলেন।

---

* স্বরচিত বিদ্যাসাগরচরিত, ১৪ পৃষ্ঠা।

বঙ্গদেশের সৌভাগ্যক্রমে এই ভগবতী দেবী এক অসামান্যা রমণী ছিলেন। শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের রচিত বিদ্যাসাগরগ্রন্থে এই দেবীমূর্ত্তি প্রকাশিত হইয়াছে। অধিকাংশ প্রতিমূর্ত্তিই অধিকক্ষণ দেখিবার দরকার হয় না, তাহা যেন মুহূর্ত্তকালের মধ্যেই নিঃশেষিত হইয়া যায়। তাহা নিপুণ হইতে পারে, সুন্দর হইতে পারে, তথাপি তাহার মধ্যে চিত্তনিবেশের যথোচিত স্থান পাওয়া যায় না, চিত্রপটের উপরিতলেই দৃষ্টির প্রসর পর্য্যবসিত হইয়া যায়। কিন্তু ভগবতী দেবীর এই পবিত্র মুখশ্রীর গভীরতা এবং উদারতা বহুক্ষণ নিরীক্ষণ করিয়াও শেষ করিতে পারা যায় না। উন্নত ললাটে তাঁহার বুদ্ধির প্রসার, সুদূরদর্শী স্নেহবর্ষী আয়ত নেত্র, সরল সুগঠিত নাসিকা, দয়াপূর্ণ ওষ্ঠাধর, দৃঢ়তাপূর্ণ চিবুক, এবং সমস্ত মুখের একটি মহিমময় সুসংযত সৌন্দর্য্য দর্শকের হৃদয়কে বহু দূরে এবং বহু ঊর্দ্ধে আকর্ষণ করিয়া লইয়া যায়—এবং ইহাও বুঝিতে পারি, ভক্তিবৃত্তির চরিতার্থতাসাধনের জন্য কেন বিদ্যাসাগরকে এই মাতৃদেবী ব্যতীত কোনো পৌরাণিক দেবীপ্রতিমার মন্দিরে প্রবেশ করিতে হয় নাই।

ভগবতী দেবীর অকুণ্ঠিত দয়া তাঁহার গ্রাম, পল্লী, প্রতিবেশীকে নিয়ত অভিষিক্ত করিয়া রাখিত। রোগার্ত্তের সেবা, ক্ষুধার্ত্তকে অন্নদান এবং শোকাতুরের দুঃখে শোক-প্রকাশ করা তাঁহার নিত্যনিয়মিত কার্য্য ছিল। অগ্নিদাহে

বীরসিংহগ্রামের বাসস্থান ভস্মীভূত হইয়া গেলে বিদ্যাসাগর যখন তাঁহার জননীদেবীকে কলিকাতায় লইয়া যাইবার চেষ্টা করেন, তিনি বলিলেন, "যে সকল দরিদ্রলোকের সন্তানগণ এখানে ভোজন করিয়া বীরসিংহবিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করে, আমি এস্থান পরিত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে প্রস্থান করিলে তাহারা কি খাইয়া স্কুলে অধ্যয়ন করিবে?" *

দয়াবৃত্তি আরো অনেক রমণীর মধ্যে দেখা যায়; কিন্তু ভগবতী দেবীর দয়ার মধ্যে একটি অসাধারণত্ব ছিল, তাহা কোনোপ্রকার সঙ্কীর্ণ সংস্কারের দ্বারা বদ্ধ ছিল না। সাধারণ লোকের দয়া দিয়াশলাই-শলাকার মত কেবল বিশেষরূপ সংঘর্ষেই জ্বলিয়া উঠে এবং তাহা অভ্যাস ও লোকাচারের ক্ষুদ্র বাক্সের মধ্যেই বদ্ধ। কিন্তু ভগবতী দেবীর হৃদয়, সূর্য্যের ন্যায়, আপনার বুদ্ধি-উজ্জ্বল দয়ারশ্মি স্বভাবতঃই চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ করিয়া দিত, শাস্ত্র বা প্রথাসংঘর্ষের অপেক্ষা করিত না। বিদ্যাসাগরের তৃতীয় সহোদর শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয় তাঁহার ভ্রাতার জীবনচরিতে লিখিয়াছেন যে, একবার বিদ্যাসাগর তাঁহার জননীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "বৎসরের মধ্যে একদিন পূজা করিয়া ৬।৭ শত টাকা বৃথা ব্যয় করা ভাল, কি গ্রামের নিরুপায় অনাথ লোকদিগকে ঐ টাকা অবস্থানুসারে মাসে মাসে কিছু কিছু সাহায্য করা ভাল?" ইহা শুনিয়া জননীদেবী উত্তর করেন, "গ্রামের

* সহোদর শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন প্রণীত বিদ্যাসাগরজীবনচরিত, ২০০ পৃষ্ঠা।

দরিদ্র নিরুপায় লোক প্রত্যহ খাইতে পাইলে পূজা করিবার আবশ্যক নাই।" এ কথাটি সহজ কথা নহে,—তাঁহার নির্ম্মলবুদ্ধি এবং উজ্জ্বল দয়া প্রাচীন সংস্কারের মোহাবরণ যে এমন অনায়াসে বর্জ্জন করিতে পারে, ইহা আমার নিকট বড় বিস্ময়কর বোধ হয়। লৌকিকপ্রথার বন্ধন রমণীর কাছে যেমন দৃঢ়, এমন আর কাহার কাছে? অথচ কি আশ্চর্য্যস্বাভাবিক চিত্তশক্তির দ্বারা তিনি জড়তাময় প্রথাভিত্তি ভেদ করিয়া নিত্যজ্যোতির্ম্ময় অনন্ত বিশ্বধর্ম্মাকাশের মধ্যে উত্তীর্ণ হইলেন। এ কথা তাঁহার কাছে এত সহজ বোধ হইল কি করিয়া যে, মনুষ্যের সেবাই যথার্থ দেবতার পূজা? তাহার কারণ, সকল সংহিতা অপেক্ষা প্রাচীনতম সংহিতা তাঁহার হৃদয়ের মধ্যে স্পষ্টাক্ষরে লিখিত ছিল।

সিবিলিয়ান্ হ্যারিসন্‌সাহেব যখন কার্য্যোপলক্ষ্যে মেদিনীপুরজেলায় গমন করেন, তখন ভগবতী দেবী তাঁহাকে স্বনামে পত্র পাঠাইয়া বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়াছিলেন; তৎসম্বন্ধে তাঁহার তৃতীয়পুত্র শম্ভুচন্দ্র নিম্নলিখিত বর্ণনা প্রকাশ করিয়াছেন;—"জননীদেবী সাহেবের ভোজনসময়ে উপস্থিত থাকিয়া তাঁহাকে ভোজন করাইয়াছিলেন। তাহাতে সাহেব আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলেন যে, অতি বৃদ্ধা হিন্দুস্ত্রীলোক সাহেবের ভোজনসময়ে চেয়ারে উপবিষ্টা হইয়া কথাবার্ত্তা কহিতে প্রবৃত্ত হইলেন। সাহেব হিন্দুর মত জননীকে ভূমিষ্ঠ হইয়া মাতৃভাবে অভিবাদন করেন। তদনন্তর নানা

বিষয়ের কথাবার্ত্তা হইল। জননীদেবী প্রবীণ হিন্দু স্ত্রীলোক তথাপি তাঁহার স্বভাব অতি উদার, মন অতিশয় উন্নত এবং মনে কিছুমাত্র কুসংস্কার নাই। কি ধনশালী কি দরিদ্র, কি বিদ্বান্ কি মূর্খ, কি উচ্চজাতীয় কি নীচজাতীয়, কি পুরুষ কি স্ত্রী, কি হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী কি অন্যধর্ম্মাবলম্বী, সকলেরই প্রতি সমদৃষ্টি।"*

বিদ্যাসাগর তাঁহার বর্ণপরিচয় প্রথমভাগে গোপাল নামক একটি সুবোধ ছেলের দৃষ্টান্ত দিয়াছেন, তাহাকে বাপমায়ে যাহা বলে, সে তাহাই করে। কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্র নিজে যখন সেই গোপালের বয়সী ছিলেন, তখন গোপালের অপেক্ষা কোনো কোনো অংশে রাখালের সঙ্গেই তাঁহার অধিকতর সাদৃশ্য দেখা যাইত। পিতার কথা পালন করা দূরে থাক্, পিতা যাহা বলিতেন, তিনি ঠিক তাহার উল্টা করিয়া বসিতেন। শম্ভুচন্দ্র লিখিয়াছেন—"পিতা তাঁহার স্বভাব বুঝিয়া চলিতেন। যেদিন শাদাবস্ত্র না থাকিত, সেদিন বলিতেন, আজ ভাল কাপড পরিয়া কালেজে যাইতে হইবে; তিনি হঠাৎ বলিতেন, না, আজ ময়লা কাপড় পরিয়া যাইব। যেদিন বলিতেন, আজ স্নান করিতে হইবে; শ্রবণমাত্র দাদা বলিতেন যে, আজ স্নান করিব না; পিতা প্রহার করিয়াও স্নান করাইতে পারিতেন না। সঙ্গে করিয়া টঁ্যাকশালের ঘাটে নামাইয়া দিলেও দাঁড়াইয়া

* সহোদর শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন প্রণীত বিদ্যাসাগরজীবনচরিত, ১৯৯ পৃষ্ঠা।

থাকিতেন। পিতা চড়চাপড় মারিয়া জোর করিয়া স্নান করাইতেন।"

পাঁচ ছয় বৎসর বয়সের সময় যখন গ্রামের পাঠশালায় পড়িতে যাইতেন, তখন প্রতিবেশী মথুর মণ্ডলের স্ত্রীকে রাগাইয়া দিবার জন্য যে প্রকার সভ্যবিগর্হিত উপদ্রব তিনি করিতেন, বর্ণপরিচয়ের সর্ব্বজননিন্দিত রাখাল বেচারাও বোধ করি এমন কাজ কখনো করে নাই।

নিরীহ বাংলাদেশে গোপালের মত সুবোধ ছেলের অভাব নাই। এই ক্ষীণতেজ দেশে রাখাল এবং তাহার জীবনীলেখক ঈশ্বরচন্দ্রের মত দুর্দ্দান্ত ছেলের প্রাদুর্ভাব হইলে বাঙালী জাতির শীর্ণচরিত্রের অপবাদ ঘুচিয়া যাইতে পারে। সুবোধ ছেলেগুলি পাস্ করিয়া ভাল চাকুরি-বাকুরি ও বিবাহকালে প্রচুর পণ লাভ করে, সন্দেহ নাই, কিন্তু দুষ্ট অবাধ্য অশান্ত ছেলেগুলির কাছে স্বদেশের জন্য অনেক আশা করা যায়। বহুকাল পূর্ব্বে একদা নবদ্বীপের শচীমাতার এক প্রবল দুরন্ত ছেলে এই আশা পূর্ণ করিয়াছিলেন।

কিন্তু একটা বিষয়ে রাখালের সহিত তাহার জীবনচরিতলেখকের সাদৃশ্য ছিল না। "রাখাল পড়িতে যাইবার সময় পথে খেলা করে, মিছামিছি দেরি করিয়া, সকলের শেষে পাঠশালায় যায়।" কিন্তু পড়াশুনায় বালক ঈশ্বরচন্দ্রের কিছুমাত্র শৈথিল্য ছিল না। যে প্রবল জিদের সহিত তিনি পিতার আদেশ ও নিষেধের বিপরীত কাজ করিতে প্রবৃত্ত

হইতেন, সেই দুর্দ্দম জিদের সহিত তিনি পড়িতে যাইতেন। সেও তাঁহার প্রতিকূল অবস্থার বিরুদ্ধে নিজের জিদ্‌রক্ষা। ক্ষুদ্র একগুঁয়ে ছেলেটি মাথায় এক মস্ত ছাতা তুলিয়া তাঁহাদের বড়বাজারের বাসা হইতে পটলডাঙায় সংস্কৃত কালেজে যাত্রা করিতেন; লোকে মনে করিত, একটা ছাতা চলিয়া যাইতেছে। এই দুর্জ্জয় বালকের শরীরটি খর্ব্ব, শীর্ণ; মাথাটা প্রকাণ্ড;— স্কুলের ছেলেরা সেইজন্য তাঁহাকে যশুরে কৈ ও তাহার অপ-ভ্রংশে কসুরে জৈ বলিয়া ক্ষ্যাপাইত; তিনি তখন তোৎলা ছিলেন, রাগিয়া কথা কহিতে পারিতেন না। *

এই বালক রাত্রি দশটার সময় শুইতে যাইতেন। পিতাকে বলিয়া যাইতেন, রাত্রি দুইপ্রহরের সময় তাঁহাকে জাগাইয়া দিতে। পিতা আর্ম্মাণিগির্জ্জার ঘড়িতে বারোটা বাজিলেই ঈশ্বরচন্দ্রকে জাগাইতেন, বালক অবশিষ্ট রাত্রি জাগিয়া পড়া করিতেন। ইহাও একগুঁয়ে ছেলের নিজের শরীরের প্রতি জিদ্‌। শরীরও তাহার প্রতিশোধ তুলিতে ছাড়িত না। মাঝে মাঝে সাংঘাতিক পীড়া হইয়াছিল, কিন্তু পীড়ার শাসন তাঁহাকে পরাভূত করিতে পারে নাই।

ইহার উপরে গৃহকর্ম্মও অনেক ছিল। বাসায় তাঁহার পিতা ও মধ্যমভ্রাতা ছিলেন। দাসদাসী ছিল না। ঈশ্বরচন্দ্র দুইবেলা সকলের রন্ধনাদি কার্য্য করিতেন। সহোদর শম্ভুচন্দ্র তাহার বর্ণনা করিয়াছেন। প্রত্যূষে নিদ্রাভঙ্গ

* সহোদর শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন প্রণীত বিদ্যাসাগরজীবনচরিত।

হইলে ঈশ্বরচন্দ্র কিয়ৎক্ষণ পুস্তক আবৃত্তি করিয়া গঙ্গার ঘাটে স্নান করিয়া কাশীনাথ বাবুর বাজারে বাটামাছ ও আলুপটল-তরকারী ক্রয় করিয়া আনিতেন। বাটনা বাটিয়া উনান্ ধরাইয়া রন্ধন করিতেন। বাসায় তাঁহারা চারিজন খাইতেন। আহারের পর উচ্ছিষ্ট মুক্ত ও বাসন ধৌত করিয়া তবে পড়িতে যাইবার অবসর পাইতেন। পাক করিতে করিতে ও স্কুলে যাইবার সময় পথে চলিতে চলিতে পাঠানুশীলন করিতেন।

এই ত অবস্থা! এদিকে ছুটির সময় যখন জল খাইতে যাইতেন, তখন স্কুলের ছাত্র যাহারা উপস্থিত থাকিত, তাহা-দিগকে মিষ্টান্ন খাওয়াইতেন। স্কুল হইতে মাসিক যে বৃত্তি পাইতেন, ইহাতেই তাহা ব্যয় হইত। আবার, দরোয়ানের নিকট ধার করিয়া দরিদ্র ছাত্রদিগকে নূতন বস্ত্র কিনিয়া দিতেন। পূজার ছুটির পর দেশে গিয়া "দেশস্থ যে সকল লোকের দিনপাত হওয়া দুষ্কর দেখিতেন, তাহাদিগকে যথাসাধ্য সাহায্য করিতে ক্ষান্ত থাকিতেন না। অন্যান্য লোকের পরিধেয় বস্ত্র না থাকিলে, গামছা পরিধান করিয়া নিজের বস্ত্রগুলি তাহাদিগকে বিতরণ করিতেন।" *

যে অবস্থায় মানুষ নিজের নিকট নিজে প্রধান দয়ার পাত্র, সে অবস্থায় ঈশ্বরচন্দ্র অন্যকে দয়া করিয়াছেন। তাঁহার জীবনে প্রথম হইতে ইহাই দেখা যায় যে, তাঁহার চরিত্র

* সহোদর শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন প্রণীত বিদ্যাসাগরজীবনচরিত, ৩৭ পৃষ্ঠা।

সমস্ত প্রতিকূল অবস্থার বিরুদ্ধে ক্রমাগতই যুদ্ধ করিয়া জয়-লাভ করিয়াছে। তাঁহার মত অবস্থাপন্ন ছাত্রের পক্ষে বিদ্যালাভ করা পরম দুঃসাধ্য, কিন্তু এই গ্রাম্যবালক শীর্ণ খর্ব্বদেহ এবং প্রকাণ্ড মাথা লইয়া আশ্চর্য্য অল্পকালের মধ্যেই বিদ্যাসাগর-উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন। তাঁহার মত দরিদ্রাবস্থার লোকের পক্ষে দান করা, দয়া করা, বড় কঠিন, কিন্তু তিনি যখন যে অবস্থাতেই পড়িয়াছেন, নিজের কোন প্রকার অসচ্ছলতায় তাঁহাকে পরের উপকার হইতে বিরত করিতে পারে নাই, এবং অনেক মহৈশ্বর্য্যশালী রাজা-রায়-বাহাদুর প্রচুর ক্ষমতা লইয়া যে উপাধি লাভ করিতে পারে নাই, এই দরিদ্র পিতার দরিদ্র সন্তান সেই 'দয়ার সাগর' নামে বঙ্গদেশে চিরদিনের জন্য বিখ্যাত হইয়া রহিলেন।

কলেজ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া বিদ্যাসাগর প্রথমে ফোর্ট উইলিয়ম্ কলেজের প্রধান পণ্ডিত ও পরে সংস্কৃত কলেজের অ্যাসিষ্টাণ্ট্ সেক্রেটারির পদে নিযুক্ত হন। এই কার্য্যোপ-লক্ষ্যে তিনি যে সকল ইংরাজ প্রধান কর্ম্মচারীদের সংস্রবে আসিয়াছিলেন, সকলেরই পরম শ্রদ্ধা ও প্রীতি-ভাজন হইয়া-ছিলেন। আমাদের দেশে প্রায় অনেকেই নিজের এবং স্বদেশের মর্য্যাদা নষ্ট করিয়া ইংরাজের অনুগ্রহলাভ করেন। কিন্তু বিদ্যাসাগর সাহেবের হস্ত হইতে শিরোপা লইবার জন্য কখন মাথা নত করেন নাই; তিনি আমাদের দেশের ইংরাজপ্রসাদগর্ব্বিত সাহেবানুজীবীদের মত আত্মাবমাননার

মূল্যে বিক্রীত সম্মান ক্রয় করিতে চেষ্টা করেন নাই। একটা উদাহরণে তাহার প্রমাণ হইবে।—একবার তিনি কার্য্যোপলক্ষ্যে হিন্দুকলেজের প্রিন্সিপল্ কার্-সাহেবের সঙ্গে দেখা করিতে গিয়াছিলেন। সভ্যতাভিমানী সাহেব তাঁহার বুট্-বেষ্টিত দুই পা টেবিলের উপরে ঊর্দ্ধগামী করিয়া দিয়া বাঙালী ভদ্রলোকের সহিত ভদ্রতারক্ষা করা বাহুল্য বোধ করিয়াছিলেন। কিছুদিন পরে ঐ কার্সাহেব কার্য্যবশতঃ সংস্কৃতকলেজে বিদ্যাসাগরের সহিত দেখা করিতে আসিলে, বিদ্যাসাগর চটিজুতাসমেত তাঁহার সর্ব্বজনবন্দনীয় চরণযুগল টেবিলের উপর প্রসারিত করিয়া এই অহঙ্কৃত ইংরাজ অভ্যাগতের সহিত আলাপ করিলেন। বোধ করি শুনিয়া কেহ বিস্মিত হইবেন না, সাহেব নিজের এই অবিকল অনুকরণ দেখিয়া সন্তোষলাভ করেন নাই।

ইতিমধ্যে কলেজের কার্য্যপ্রণালীসম্বন্ধে তাঁহার সহিত কর্ত্তৃপক্ষের মনান্তর হওয়ায় ঈশ্বরচন্দ্র কর্ম্মত্যাগ করিলেন। সম্পাদক রসময় দত্ত এবং শিক্ষাসমাজের অধ্যক্ষ ময়েট্ সাহেব অনেক উপরোধ-অনুরোধ করিয়াও কিছুতেই তাঁহার পণ ভঙ্গ করিতে পারিলেন না। আত্মীয়-বান্ধবেরা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, তোমার চলিবে কি করিয়া? তিনি বলিলেন, আলুপটল বেচিয়া, মুদির দোকান করিয়া দিন চালাইব। তখন বাসায় প্রায় কুড়িটি বালককে তিনি অন্নবস্ত্র দিয়া অধ্যয়ন করাইতেছিলেন—তাহাদের কাহাকেও বিদায়

করিলেন না। তাঁহাব পিতা পূর্ব্বে চাকরি করিতেন—বিদ্যাসাগরের সবিশেষ অনুরোধে কার্য্যত্যাগ করিয়া বাড়ী বসিয়া সংসারখরচের টাকা পাইতেছিলেন। বিদ্যাসাগর কাজ ছাড়িয়া দিয়া প্রতিমাসে ধার করিয়া পঞ্চাশটাকা বাড়ী পাঠাইতে লাগিলেন। এই সময় ময়েট্ সাহেবের অনুরোধে বিদ্যাসাগর কাপ্তেন্-ব্যাঙ্ক্-নামক একজন ইংরাজকে কয়েক মাস বাংলা ও হিন্দী শিখাইতেন। সাহেব যখন মাসিক পঞ্চাশ টাকা হিসাবে বেতন দিতে গেলেন, তিনি বলিলেন, আপনি ময়েট্ সাহেবের বন্ধু এবং ময়েট্ সাহেব আমার বন্ধু—আপনার কাছে আমি বেতন লইতে পারি না।

১৮৫০ খৃষ্টাব্দে বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজের সাহিত্য-অধ্যাপক ও ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে উক্ত কলেজের প্রিন্সিপল্-পদে নিযুক্ত হন। আট বৎসর দক্ষতার সহিত কাজ করিয়া শিক্ষাবিভাগের নবীন কর্ত্তা এক তরুণ সিবিলিয়ানের সহিত মতান্তর হইতে থাকায় ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে তিনি কর্ম্মত্যাগ করেন। বিদ্যাসাগর স্বভাবতই সম্পূর্ণ স্বাধীনতন্ত্রের লোক ছিলেন; অব্যাহতভাবে আপন ইচ্ছা চালনা করিতে পাইলে তবে তিনি কাজ করিতে পারিতেন; উপরিতন কর্ত্তৃপক্ষের মতের দ্বারা কোনরূপ প্রতিঘাত প্রাপ্ত হইলে তদনুসারে আপন সঙ্কল্পের প্রবাহ তিলমাত্র পরিবর্ত্তন করিতে পারিতেন না। কর্ম্মনীতির নিয়মে ইহা তাঁহার পক্ষে প্রশংসনীয় ছিল না, কিন্তু বিধাতা তাঁহাকে একাধিপত্য করিবার জন্য

পাঠাইয়াছিলেন ; অধীনে কাজ চালাইবার গুণগুলি তাঁহাকে দেন নাই। উপযুক্ত অধীনস্থ কর্ম্মচারী বাংলাদেশে যথেষ্ট আছে,—বিদ্যাসাগরকে দিয়া তাহাদের সংখ্যাবৃদ্ধি করা বিধাতা অনাবশ্যক ও অসঙ্গত বোধ করিয়াছিলেন।

বিদ্যাসাগর যখন সংস্কৃতকলেজে নিযুক্ত, তখন কলেজের কাজকর্ম্মের মধ্যে থাকিয়াও এক প্রচণ্ড সমাজসংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। একদিন বীরসিংহবাটীর চণ্ডীমণ্ডপে বসিয়া ঈশ্বরচন্দ্র তাঁহার পিতার সহিত বীরসিংহ-স্কুলসম্বন্ধে আলোচনা করিতেছিলেন, এমন সময় তাঁহার মাতা রোদন করিতে করিতে চণ্ডীমণ্ডপে আসিয়া একটি বালিকার বৈধব্য-সংঘটনেব উল্লেখ কবিয়া তাঁহাকে বলিলেন, তুই এতদিন এত শাস্ত্র পডিলি, তাহাতে বিধবার কি কোন উপায় নাই ?* মাতার পুত্র উপায় অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইলেন।

স্ত্রীজাতির প্রতি বিদ্যাসাগরের বিশেষ স্নেহ ও ভক্তি ছিল। ইহাও তাঁহার সুমহৎ পৌরুষের একটি প্রধান লক্ষণ। সাধারণতঃ আমরা স্ত্রীজাতির প্রতি ঈর্ষাবিশিষ্ট ; অবলা স্ত্রীলোকের সুখ-স্বাস্থ্য-স্বচ্ছন্দতা আমাদের নিকট পরম পরিহাসের বিষয়, প্রহসনের উপকরণ। আমাদের ক্ষুদ্রতা ও কাপুরুষতার অন্যান্য লক্ষণের মধ্যে ইহাও একটি।

বিদ্যাসাগর শৈশবে জগদ্দুর্লভবাবুর বাসায় আশ্রয় পাইয়াছিলেন। জগদ্দুর্লভের কনিষ্ঠা ভগিনী রাইমণির

* সহোদর শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন প্রণীত বিদ্যাসাগরজীবনচরিত, ১১০ পৃষ্ঠা

সম্বন্ধে তিনি স্বরচিত জীবনবৃত্তান্তে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা এস্থলে উদ্ধৃত করা যাইতে পারে :—"রাইমণির অদ্ভুত স্নেহ ও যত্ন আমি কস্মিন্‌কালেও বিস্মৃত হইতে পারিব না। তাঁহার একমাত্র পুত্র গোপালচন্দ্র ঘোষ আমার প্রায় সমবয়স্ক ছিলেন। পুত্রের উপর জননীর যেরূপ স্নেহ ও যত্ন থাকা উচিত ও আবশ্যক, গোপালচন্দ্রের উপর রাইমণির স্নেহ ও যত্ন তদপেক্ষা অধিকতর ছিল, তাহার সংশয় নাই। কিন্তু আমার আন্তরিক দৃঢ় বিশ্বাস এই যে, স্নেহ ও যত্নবিষয়ে আমায় ও গোপালে রাইমণির অণুমাত্র বিভিন্নভাব ছিল না। ফল কথা এই, স্নেহ, দয়া, সৌজন্য, অমায়িকতা, সদ্বিবেচনা প্রভৃতি সদ্‌গুণবিষয়ে, রাইমণির সমকক্ষ স্ত্রীলোক এ পর্য্যন্ত আমার নয়নগোচর হয় নাই। এই দয়াময়ীর সৌম্যমূর্ত্তি আমার হৃদয়মন্দিরে দেবীমূর্ত্তির ন্যায় প্রতিষ্ঠিত হইয়া বিরাজমান রহিয়াছে। প্রসঙ্গক্রমে তাঁহার কথা উত্থাপিত হইলে তদীয় অপ্রতিম-গুণের কীর্ত্তন করিতে করিতে অশ্রুপাত না করিয়া থাকিতে পারি না। আমি স্ত্রীজাতির পক্ষপাতী বলিয়া অনেকে নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। আমার বোধ হয়, সে নির্দ্দেশ অসঙ্গত নহে। যে ব্যক্তি রাইমণির স্নেহ, দয়া, সৌজন্য প্রভৃতি প্রত্যক্ষ করিয়াছে এবং ঐ সমস্ত সদ্‌গুণের ফলভোগী হইয়াছে, সে যদি স্ত্রীজাতির পক্ষপাতী না হয়, তাহা হইলে, তাহার তুল্য কৃতঘ্ন পামর ভূমণ্ডলে নাই।"

স্ত্রীজাতির স্নেহ-দয়া-সৌজন্য হইতে বঞ্চিত হইয়াছে, আমাদের মধ্যে এমন হতভাগ্য কয়জন আছে ? কিন্তু ক্ষুদ্র হৃদয়ের স্বভাব এই যে, সে যে পরিমাণে অযাচিত উপকার প্রাপ্ত হয়, সেই পরিমাণে অকৃতজ্ঞ হইয়া উঠে। যাহা কিছু সহজেই পায়, তাহাই আপনার প্রাপ্য বলিয়া জানে; নিজের দিক্ হইতে যে কিছুমাত্র দেয় আছে, তাহা সহজেই ভুলিয়া যায়।

বিদ্যাসাগর প্রথমতঃ বেথুন্‌সাহেবের সহায়তা করিয়া বঙ্গদেশে স্ত্রীশিক্ষার সূচনা ও বিস্তার করিয়া দেন। অবশেষে যখন তিনি বালবিধবাদের দুঃখে ব্যথিত হইয়া বিধবাবিবাহপ্রচলনের চেষ্টা করেন, তখন দেশের মধ্যে সংস্কৃতশ্লোক ও বাংলা গালি মিশ্রিত এক তুমুল কলকোলাহল উত্থিত হইল। সেই মুষলধারে শাস্ত্র ও গালিবর্ষণের মধ্যে এই ব্রাহ্মণবীর বিজয়ী হইয়া বিধবাবিবাহ শাস্ত্রসম্মত প্রমাণ করিলেন এবং তাহা রাজবিধিসম্মত করিয়া লইলেন।

বিদ্যাসাগর এই সময়ে আরো একটি ক্ষুদ্র সামাজিক যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াছিলেন, এস্থলে তাহারও সংক্ষেপে উল্লেখ আবশ্যক। তখন সংস্কৃতকলেজে কেবল ব্রাহ্মণেরই প্রবেশ ছিল, সেখানে শূদ্রেরা সংস্কৃত পড়িতে পাইত না। বিদ্যাসাগর সকল বাধা অতিক্রম করিয়া শূদ্রদিগকে সংস্কৃত কলেজে বিদ্যাশিক্ষার অধিকার দান করেন।

সংস্কৃতকলেজের কর্ম্ম ছাড়িয়া দিবার পর বিদ্যাসাগরের

প্রধান কীর্ত্তি মেট্রোপলিটান্ ইন্‌ষ্টিট্যুশন্। বাঙালীর নিজের চেষ্টায় এবং নিজের অধীনে উচ্চতর শিক্ষার কলেজ-স্থাপন এই প্রথম। আমাদের দেশে ইংরাজি শিক্ষাকে স্বাধীনভাবে স্থায়ী করিবার এই প্রথম ভিত্তি বিদ্যাসাগর-কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইল। যিনি দরিদ্র ছিলেন, তিনি দেশের প্রধান দাতা হইলেন; যিনি লোকাচাররক্ষক ব্রাহ্মণপণ্ডিতের বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তিনি লোকাচারের একটি সুদৃঢ় বন্ধন হইতে সমাজকে মুক্ত করিবার জন্য সুকঠোর সংগ্রাম করিলেন, এবং সংস্কৃতবিদ্যায় যাঁহার অধিকারের ইয়ত্তা ছিল না, তিনিই ইংরাজিবিদ্যাকে প্রকৃতপ্রস্তাবে স্বদেশের ক্ষেত্রে বদ্ধমূল করিয়া রোপণ করিয়া গেলেন।

বিদ্যাসাগর তাঁহার জীবনের অবশিষ্টকাল এই স্কুল ও কলেজটিকে একাগ্রচিত্তে প্রাণাধিকযত্নে পালন করিয়া, দীনদরিদ্র রোগীর সেবা করিয়া, অকৃতজ্ঞদিগকে মার্জ্জনা করিয়া, বন্ধুবান্ধবদিগকে অপরিমেয় স্নেহে অভিষিক্ত করিয়া, আপন পুষ্পকোমল এবং বজ্রকঠিন বক্ষে দুঃসহ বেদনাশল্য বহন করিয়া, আপন আত্মনির্ভরপর উন্নত-বলিষ্ঠ চরিত্রের মহান্ আদর্শ বাঙালীজাতির মনে চিরাঙ্কিত করিয়া দিয়া ১২৯৮ সালের ১৩ই শ্রাবণ রাত্রে ইহলোক হইতে অপসৃত হইয়া গেলেন।

বিদ্যাসাগর বঙ্গদেশে তাঁহার অক্ষয় দয়ার জন্য বিখ্যাত। কারণ, দয়াবৃত্তি আমাদের অশ্রুপাতপ্রবণ বাঙালীহৃদয়কে

যত শীঘ্র প্রশংসায় বিচলিত করিতে পারে, এমন আর কিছুই নহে। কিন্তু বিদ্যাসাগরের দয়ায় কেবল যে বাঙালীজনসুলভ হৃদয়ের কোমলতা প্রকাশ পায়, তাহা নহে, তাহাতে বাঙালীদুর্লভ চরিত্রের বলশালিতারও পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার দয়া কেবল একটা প্রবৃত্তির ক্ষণিক উত্তেজনামাত্র নহে, তাহার মধ্যে একটা সচেষ্ট আত্মশক্তির অচল কর্তৃত্ব সর্ব্বদা বিরাজ করিত বলিয়াই তাহা এমন মহিমশালিনী। এ দয়া অন্যের কষ্টলাঘবের চেষ্টায় আপনাকে কঠিন কষ্টে ফেলিতে মুহূর্ত্তকালের জন্য কুণ্ঠিত হইত না। সংস্কৃতকলেজে কাজ করিবার সময় ব্যাকরণ-অধ্যাপকের পদ শূন্য হইলে বিদ্যাসাগর তারানাথ তর্কবাচস্পতির জন্য মার্শাল্‌সাহেবকে অনুরোধ করেন। সাহেব বলিলেন, তাঁহার চাক্‌রি লইবার ইচ্ছা আছে কি না, অগ্রে জানা আবশ্যক। শুনিয়া বিদ্যাসাগর সেইদিনেই ত্রিশক্রোশ পথ দূরে কালনায় তর্কবাচস্পতির চতুষ্পাঠী-অভিমুখে পদব্রজে যাত্রা করিলেন। পরদিন তর্কবাচস্পতির সম্মতি ও তাঁহার প্রশংসাপত্রগুলি লইয়া পুনরায় পদব্রজে যথাসময়ে সাহেবের নিকট উপস্থিত হইলেন।* পরের উপকারকার্য্যে তিনি আপনার সমস্ত বল ও উৎসাহ প্রয়োগ করিতেন। ইহার মধ্যেও তাঁহার আজন্মকালের একটা জিদ্‌ প্রকাশ পাইত। সাধারণতঃ আমাদের দয়ার মধ্যে এই

---

* সহোদর শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন প্রণীত বিদ্যাসাগরজীবনচরিত।

জিদ্ না থাকাতে তাহা সঙ্কীর্ণ ও স্বল্পফলপ্রসূ হইয়া বিশীর্ণ হইয়া যায়, তাহা পৌরুষমহত্ত্ব লাভ করে না।

কারণ, দয়া বিশেষরূপে স্ত্রীলোকের নহে; প্রকৃত দয়া যথার্থ পুরুষেরই ধর্ম্ম। দয়ার বিধান পূর্ণরূপে পালন করিতে হইলে দৃঢ় বীর্য্য এবং কঠিন অধ্যবসায় আবশ্যক, তাহাতে অনেকসময় সুদূরব্যাপী সুদীর্ঘ কর্ম্মপ্রণালী অনুসরণ করিয়া চলিতে হয়; তাহা কেবল ক্ষণকালের আত্মত্যাগের দ্বারা প্রবৃত্তির উচ্ছ্বাসনিবৃত্তি এবং হৃদয়ের ভারলাঘব করা নহে; তাহা দীর্ঘকাল ধরিয়া নানা উপায়ে নানা বাধা অতিক্রম করিয়া দুরূহ উদ্দেশ্যসিদ্ধির অপেক্ষা রাখে।

একবার গবর্মেণ্টের কোন অত্যুৎসাহী ভৃত্য জাহানাবাদ-মহকুমায় ইন্‌কাম্‌ট্যাক্স ধার্য্যের জন্য উপস্থিত হন। আয়ের স্বল্পতাপ্রযুক্ত যে সকল ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী ইন্‌কাম্‌ট্যাক্সের অধীনে না আসিতে পারে, গবর্মেণ্টের এই সুচতুর শিকারী তাহাদের দুইতিনজনের নাম একত্র করিয়া ট্যাক্সের জালে বদ্ধ করিতেছিলেন। বিদ্যাসাগর ইহা শুনিয়া তৎক্ষণাৎ খড়ারগ্রামে অ্যাসেসর্‌বাবুর নিকটে আসিয়া আপত্তিপ্রকাশ করেন। বাবুটি তাহাতে কর্ণপাত না করিয়া অভিযোগকারীদিগকে ধমক দিয়া বাধ্য করিলেন। বিদ্যাসাগর অবিলম্বে কলিকাতায় আসিয়া লেফ্‌টেনেণ্ট গবর্ণরের নিকট বাদী হইলেন। লেফ্‌টেনেণ্ট গবর্ণর বর্দ্ধমানের কালেক্টর হ্যারিসন্-সাহেবকে তদন্তজন্য প্রেরণ করেন। বিদ্যাসাগর হ্যারিসনের



সঙ্গে গ্রামে গ্রামে ব্যবসায়ীদের খাতাপত্র পরীক্ষা করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন—এইরূপে দুইমাসকাল অনন্যমনা ও অনন্যকর্ম্মা হইয়া তিনি এই অন্যায় নিবারণে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন।*

বিদ্যাসাগরের জীবনে এরূপ দৃষ্টান্ত আরো অনেক দেওয়া যাইতে পারে। কিন্তু এরূপ দৃষ্টান্ত বাংলায় অন্যত্র হইতে সংগ্রহ করা দুষ্কর। আমাদের হৃদয় অত্যন্ত কোমল বলিয়া আমরা প্রচার করিয়া থাকি, কিন্তু আমরা কোনো ঝঞ্ঝাটে যাইতে চাহি না। এই অলস শান্তিপ্রিয়তা আমাদিগকে অনেক সময়েই স্বার্থপর নিষ্ঠুরতায় অবতীর্ণ করে। একজন জাহাজীগোরা কিছুমাত্র চিন্তা না করিয়া মজ্জমান ব্যক্তির পশ্চাতে জলে ঝাঁপ দিয়া পড়ে; কিন্তু একখানা নৌকা যেখানে বিপন্ন, অন্য নৌকাগুলি তাহার কিছুমাত্র সাহায্য-চেষ্টা না করিয়া চলিয়া যায়, এরূপ ঘটনা আমাদের দেশে সর্ব্বদাই শুনিতে পাই। দয়ার সহিত বীর্য্যের সম্মিলন না হইলে সে দয়া অনেকস্থলেই অকিঞ্চিৎকর হইয়া থাকে।

কেবল যে সঙ্কট এবং অধ্যবসায়ের ক্ষেত্রে আমাদের অন্তঃপুরচারিণী দয়া প্রবেশ করিতে চাহে না, তাহা নহে। সামাজিক কৃত্রিম শুচিতারক্ষার নিয়মলঙ্ঘনও তাহার পক্ষে দুঃসাধ্য। আমি জানি, কোন এক গ্রাম্যমেলায় এক বিদেশী ব্রাহ্মণের মৃত্যু হইলে ঘৃণা করিয়া কেহই তাহার অন্ত্যেষ্টি-

* সহোদর শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন প্রণীত বিদ্যাসাগরজীবনচরিত।

সংকারের ব্যবস্থা করে নাই ; অবশেষে, তাহার অনুপস্থিত আত্মীয়পরিজনের অন্তরে চিরশোকশল্য নিহিত করিয়া ডোমের দ্বারা মৃতদেহ শ্মশানে শৃগালকুকুরের মুখে ফেলিয়া আসা হয়। আমরা অতি সহজেই 'আহা উহু' এবং অশ্রু-পাত করিতে পারি, কিন্তু কর্ম্মক্ষেত্রে পরোপকারের পথে আমরা সহস্র স্বাভাবিক এবং কৃত্রিম বাধার দ্বারা পদে পদে প্রতিহত। বিদ্যাসাগরের কারুণ্য বলিষ্ঠ,—পুরুষোচিত ; এই জন্য তাহা সরল এবং নির্ব্বিকার ; তাহা কোথাও সূক্ষ্ম তর্ক তুলিত না, নাসিকাকুঞ্চন করিত না, বসন তুলিযা ধরিত না ; একেবারে দ্রুতপদে, ঋজুরেখায়, নিঃশঙ্কে, নিঃসঙ্কোচে আপন কার্য্যে গিয়া প্রবৃত্ত হইত। রোগের বীভৎস মলিনতা তাঁহাকে কখন রোগীর নিকট হইতে দূরে রাখে নাই। এমন কি, কর্ম্মাটারে এক মেথরজাতীয়া স্ত্রীলোক ওলাউঠায় আক্রান্ত হইলে বিদ্যাসাগর স্বয়ং তাহার কুটীরে উপস্থিত থাকিয়া স্বহস্তে তাহার সেবা করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। বর্দ্ধমানবাসকালে তিনি তাঁহার প্রতিবেশী দরিদ্র মুসলমান-গণকে আত্মীয়নির্ব্বিশেষে যত্ন করিয়াছিলেন।

এই ঘটনাশ্রবণে আমাদের হৃদয় যে ভক্তিতে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে, তাহা বিদ্যাসাগরের দয়া অনুভব করিয়া নহে—কিন্তু তাঁহার মধ্য হইতে যে একটি নিঃসঙ্কোচ বলিষ্ঠ মনুষ্যত্ব পরিস্ফুট হইয়া উঠে, তাহা দেখিয়া আমাদের এই নীচজাতির প্রতি চিরাভ্যস্ত ঘৃণাপ্রবণ মনও আপন

নিগূঢ় মানবধর্ম্মবশতঃ ভক্তিতে আকৃষ্ট না হইয়া থাকিতে পারে না।

তাঁহার কারুণ্যের মধ্যে যে পৌরুষের লক্ষণ ছিল, তাহার অনেক উদাহরণ দেখা যায়। আমাদের দেশে আমরা যাঁহাদিগকে ভালমানুষ অমায়িকপ্রকৃতি বলিয়া প্রশংসা করি, সাধারণতঃ তাঁহাদের চক্ষুলজ্জা বেশী। অর্থাৎ কর্ত্তব্যস্থলে তাঁহারা কাহাকেও বেদনা দিতে পারেন না। বিদ্যাসাগরের দয়ায় সেই কাপুরুষতা ছিল না। ঈশ্বরচন্দ্র যখন কলেজের ছাত্র ছিলেন, তখন তাঁহাদের বেদান্ত-অধ্যাপক শম্ভুচন্দ্র বাচস্পতির সহিত তাঁহার বিশেষ প্রীতি-বন্ধন ছিল। বাচস্পতিমহাশয় বৃদ্ধবয়সে পুনরায় দারপরিগ্রহ করিবার ইচ্ছা করিয়া তাঁহার প্রিয়তম ছাত্রের মত জিজ্ঞাসা করিলে ঈশ্বরচন্দ্র প্রবল আপত্তি প্রকাশ করিলেন। গুরু বারংবার কাকুতিমিনতি করা সত্ত্বেও তিনি মত পরিবর্ত্তন করিলেন না। তখন বাচস্পতিমহাশয় ঈশ্বরচন্দ্রের নিষেধে কর্ণপাত না করিয়া এক সুন্দরী বালিকাকে বিবাহপূর্ব্বক তাহাকে আশু বৈধব্যের তটদেশে আনয়ন করিলেন। শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার বিদ্যাসাগর গ্রন্থে এই ব্যাপারের যে পরিণাম বর্ণন করিয়াছেন, তাহা এই স্থলে উদ্ধৃত করি :—

"বাচস্পতিমহাশয় ঈশ্বরচন্দ্রের হাত ধরিয়া বলিলেন, 'তোমার মাকে দেখিয়া যাও'। এই বলিয়া দাসীকে নব-

বধূর অবগুণ্ঠন উন্মোচন করিতে বলিলেন। তখন বাচস্পতি মহাশয়ের নববিবাহিতা পত্নীকে দেখিয়া ঈশ্বরচন্দ্র অশ্রু-সংবরণ করিতে পারিলেন না। সেই জননীস্থানীয়া বালি-কাকে দর্শন করিয়া ও এই বালিকার পরিণাম চিন্তা করিয়া বালকের ন্যায় রোদন করিতে লাগিলেন। তখন বাচস্পতি মহাশয় 'অকল্যাণ করিস্ না রে' বলিয়া তাঁহাকে লইয়া বাহিরবাটীতে আসিলেন এবং নানাপ্রকার শাস্ত্রীয় উপদেশের দ্বারা ঈশ্বরচন্দ্রের মনের উত্তেজনা ও হৃদয়ের আবেগ রোধ করিতে ও তাঁহাকে শান্ত করিতে প্রয়াস পাইতে লাগিলেন। এইরূপ বহুবিধ প্রবোধবাক্যে শান্ত করিতে প্রয়াস পাইয়া শেষে ঈশ্বরচন্দ্রকে কিঞ্চিৎ জল খাইতে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু পাষাণতুল্য-কঠিনপ্রতিজ্ঞা-পরায়ণ ঈশ্বরচন্দ্র জলযোগ করিতে সম্পূর্ণরূপে অসম্মত হইয়া বলিলেন, 'এ ভিটায় আর কখনও জলস্পর্শ করিব না'।"

বিদ্যাসাগরের হৃদয়বৃত্তির মধ্যে যে বলিষ্ঠতা দেখা যায়, তাঁহার বুদ্ধিবৃত্তির মধ্যেও তাহার পরিপূর্ণ প্রভাব প্রকাশ পায়। যথার্থ সবলতার সঙ্গে সঙ্গেই একটা সুবৃহৎ সরলতা থাকে।

এই সরলতা কেবল মতামতে নহে, লোকব্যবহারেও প্রকাশ পায়। বিদ্যাসাগর পিতৃদর্শনে কাশীতে গমন করিলে সেখানকার অর্থলোলুপ কতকগুলি ব্রাহ্মণ তাঁহাকে টাকার জন্য ধরিয়া-পড়িয়া ছিল। বিদ্যাসাগর তাহাদের অবস্থা ও

স্বভাব দৃষ্টে তাহাদিগকে দয়া অথবা ভক্তির পাত্র বলিয়া জ্ঞান করেন নাই, সেইজন্য তৎক্ষণাৎ অকপটচিত্তে উত্তর দিলেন,—"এখানে আছেন বলিয়া আপনাদিগকে যদি আমি ভক্তি বা শ্রদ্ধা করিয়া বিশ্বেশ্বর বলিয়া মান্য করি, তাহা হইলে আমার মত নরাধম আর নাই।"

... ... ইহা শুনিয়া কাশীর ব্রাহ্মণেরা ক্রোধান্ধ হইয়া বলেন, "তবে আপনি কি মানেন?" বিদ্যাসাগর উত্তর করিলেন,—"আমার বিশ্বেশ্বর ও অন্নপূর্ণা উপস্থিত এই পিতৃদেব ও জননীদেবী বিরাজমান।" *

যে বিদ্যাসাগর হীনতমশ্রেণীর লোকেরও দুঃখমোচনে কুণ্ঠিত হইতেন না, তিনি কৃত্রিম কপটভক্তি দেখাইয়া কাশীর ব্রাহ্মণের প্রার্থনা পূর্ণ করিতে পারিলেন না। ইহাই বলিষ্ঠ সরলতা, ইহাই যথার্থ পৌরুষ।

নিজের অশনবসনেও বিদ্যাসাগরের একটি অটল সরলতা ছিল এবং সেই সরলতার মধ্যেও দৃঢ় বলের পরিচয় পাওয়া যায়। পূর্ব্বেই দৃষ্টান্ত দেখান গিয়াছে, নিজের তিল-মাত্র সম্মান রক্ষার প্রতিও তাঁহার লেশমাত্র শৈথিল্য ছিল না। আমরা সাধারণতঃ প্রবল সাহেবী অথবা প্রচুর নবাবী দেখাইয়া সম্মানলাভের চেষ্টা করিয়া থাকি। কিন্তু আড়-ম্বরের চাপল্য বিদ্যাসাগরের উন্নত-কঠোর আত্মসম্মানকে কখন স্পর্শ করিতে পারিত না। ভূষণহীন সারল্যই

* সহোদর শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন প্রণীত বিদ্যাসাগরজীবনচরিত।

তাঁহার রাজভূষণ ছিল। ঈশ্বরচন্দ্র যখন কলিকাতায় অধ্যয়ন করিতেন, তখন তাঁহার দরিদ্রা "জননীদেবী চরকাসূতা কাটিয়া পুত্রদ্বয়ের বস্ত্র প্রস্তুত করিয়া কলিকাতায় পাঠাইতেন।" * সেই মোটাকাপড, সেই মাতৃস্নেহমণ্ডিত দারিদ্র্য তিনি চিরকাল সগৌরবে সর্ব্বাঙ্গে ধারণ করিয়াছিলেন। তাঁহার বন্ধু তদানীন্তন লেফ্‌টেনেণ্ট গবর্ণর হ্যালিডেসাহেব তাঁহাকে রাজসাক্ষাতের উপযুক্ত সাজ করিয়া আসিতে অনুবোধ করেন। বন্ধুর অনুরোধে বিদ্যাসাগর কেবল দুই একদিন চোগা-চাপকান পরিয়া সাহেবের সহিত দেখা করিতে গিয়াছিলেন, কিন্তু সে লজ্জা আর সহ্য করিতে পারিলেন না; বলিলেন, "আমাকে যদি এই বেশে আসিতে হয়, তবে এখানে আর আমি আসিতে পারিব না।" হ্যালিডে তাঁহাকে তাঁহার অভ্যস্তবেশে আসিতে অনুমতি দিলেন। ব্রাহ্মণপণ্ডিত যে চটিজুতা ও মোটা ধুতিচাদর পরিয়া সর্ব্বত্র সম্মানলাভ করেন, বিদ্যাসাগর রাজদ্বারেও তাহা ত্যাগ করিবার আবশ্যকতা বোধ করেন নাই। তাঁহার নিজের সমাজে যখন ইহাই ভদ্রবেশ, তখন তিনি অন্য সমাজে অন্য বেশ পরিয়া আপন সমাজের ও সেই সঙ্গে আপনার অবমাননা করিতে চাহেন নাই। শাদা ধুতি ও শাদা চাদরকে ঈশ্বরচন্দ্র যে গৌরব অর্পণ করিয়াছিলেন, আমাদের বর্ত্তমান রাজাদের ছদ্মবেশ পরিয়া আমরা

* সহোদর শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন প্রণীত বিদ্যাসাগরজীবনচরিত।

আপনাদিগকে সে গৌরব দিতে পারি না; বরঞ্চ এই কৃষ্ণ-চর্ম্মের উপর দ্বিগুণতর কৃষ্ণকলঙ্ক লেপন করি। আমাদের এই অবমানিত দেশে ঈশ্বরচন্দ্রের মত এমন অখণ্ড পৌরুষের আদর্শ কেমন করিয়া জন্মগ্রহণ করিল, আমরা বলিতে পারি না। কাকের বাসায় কোকিলে ডিম পাড়িয়া যায়,—মানব-ইতিহাসের বিধাতা সেইরূপ গোপনে কৌশলে বঙ্গভূমির প্রতি বিদ্যাসাগরকে মানুষ করিবার ভার দিয়াছিলেন।

সেইজন্য বিদ্যাসাগর এই বঙ্গদেশে একক ছিলেন। এখানে যেন তাঁহার স্বজাতির দোসর কেহ ছিল না। এদেশে তিনি তাঁহার সমযোগ্য সহযোগীর অভাবে আমৃত্যুকাল নির্ব্বাসন ভোগ করিয়া গিয়াছেন। তিনি সুখী ছিলেন না। তিনি নিজের মধ্যে যে এক অকৃত্রিম মনুষ্যত্ব সর্ব্বদাই অনুভব করিতেন, চারিদিকের জনমণ্ডলীর মধ্যে তাহার আভাস দেখিতে পান নাই। তিনি উপকার করিয়া কৃতঘ্নতা পাইয়াছেন, কার্য্যকালে সহায়তা প্রাপ্ত হন নাই;—তিনি প্রতিদিন দেখিয়াছেন, আমরা আরম্ভ করি, শেষ করি না; আড়ম্বর করি, কাজ করি না; যাহা অনুষ্ঠান করি, তাহা বিশ্বাস করি না; যাহা বিশ্বাস করি, তাহা পালন করি না; ভূরিপরিমাণ বাক্যরচনা করিতে পারি, তিলপরিমাণ আত্মত্যাগ করিতে পারি না; আমরা অহঙ্কার দেখাইযা পরিতৃপ্ত থাকি, যোগ্যতা লাভের চেষ্টা করি না; আমরা সকল কাজেই পরের প্রত্যাশা করি, অথচ পরের ত্রুটি লইয়া আকাশ বিদীর্ণ

করিতে থাকি ;—পরের অনুকরণে আমাদের গর্ব্ব, পরের অনুগ্রহে আমাদের সম্মান, পরের চক্ষে ধূলিনিক্ষেপ করিয়া আমাদের পলিটিক্স, এবং নিজের বাক্‌চাতুর্য্যে নিজের প্রতি ভক্তিবিহ্বল হইয়া উঠাই আমাদের জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য। এই দুর্ব্বল, ক্ষুদ্র, হৃদয়হীন, কর্ম্মহীন, দাম্ভিক, তার্কিক জাতির প্রতি বিদ্যাসাগরের এক সুগভীর ধিক্কার ছিল। কারণ, তিনি সর্ব্ববিষয়েই ইহাদের বিপরীত ছিলেন। বৃহৎ বনস্পতি যেমন ক্ষুদ্র বনজঙ্গলের পরিবেষ্টন হইতে ক্রমেই শূন্য আকাশে মস্তক তুলিয়া উঠে—বিদ্যাসাগর সেইরূপ বয়োবৃদ্ধিসহকারে বঙ্গসমাজের সমস্ত অস্বাস্থ্যকর ক্ষুদ্রতাজাল হইতে ক্রমশঃই শব্দহীন সুদূর নির্জ্জনে উত্থান করিয়াছিলেন ; সেখান হইতে তিনি তাপিতকে ছায়া এবং ক্ষুধিতকে ফলদান করিতেন ; কিন্তু আমাদের শতসহস্র ক্ষণজীবী সভাসমিতির ঝিল্লীঝঙ্কার হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ছিলেন। ক্ষুধিত-পীড়িত অনাথ-অসহায়দের জন্য আজ তিনি বর্ত্তমান নাই,—কিন্তু তাঁহার মহৎ চরিত্রের যে অক্ষয়বট তিনি বঙ্গভূমিতে রোপণ করিয়া গিয়াছেন, তাহার তলদেশ সমস্ত বাঙ্গালীজাতির তীর্থস্থান হইয়াছে। আমরা সেইখানে আসিয়া আমাদের তুচ্ছতা, ক্ষুদ্রতা, নিষ্ফল আড়ম্বর ভুলিয়া, সূক্ষ্মতম তর্কজাল এবং স্থূলতম জড়ত্ব বিচ্ছিন্ন করিয়া সরল, সবল, অটল মাহাত্ম্যের শিক্ষা লাভ করিয়া যাইব। আজ আমরা বিদ্যা-সাগরকে কেবল বিদ্যা ও দয়ার আধার বলিয়া জানি ; এই



ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার

বৃহৎ পৃথিবীর সংস্রবে আসিয়া যতই আমরা মানুষ হইয়া উঠিব, যতই আমরা পুরুষের মত দুর্গম-বিস্তীর্ণ কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে থাকিব, বিচিত্র শৌর্য্য-বীর্য্য-মহত্ত্বের সহিত যতই আমাদের প্রত্যক্ষ সন্নিহিতভাবে পরিচয় হইবে, ততই আমরা নিজের অন্তরের মধ্যে অনুভব করিতে থাকিব যে, দয়া নহে, বিদ্যা নহে, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের চরিত্রে প্রধান গৌরব তাঁহার অজেয় পৌরুষ, তাঁহার অক্ষয় মনুষ্যত্ব; এবং যতই তাহা অনুভব করিব, ততই আমাদের শিক্ষা সম্পূর্ণ ও বিধাতার উদ্দেশ্য সফল হইবে, এবং বিদ্যাসাগরের চরিত্র বাঙ্গালীর জাতীয়জীবনে চিরদিনের জন্য প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকিবে। (পরিবর্জ্জিত)

মহেন্দ্রলাল

হাওড়ার নয় ক্রোশ পশ্চিমে পাকৃপাড়া নামক একটী ক্ষুদ্র গ্রাম আছে। ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দের ২রা নভেম্বর, এই স্থানে ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার মহাশয়ের জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম ৺তারকনাথ সরকার। আপনাদিগের সামান্য ভূসম্পত্তির উপর নির্ভর করিয়া, তিনি জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয়।

সরকার মহাশয়ের পিতার সাংসারিক অবস্থা ভাল ছিল না। পল্লীগ্রামে কোনরূপে অন্ন-বস্ত্র সংগ্রহ হইত।

বৈধব্যের পর তাঁহার জননীকে শিশু পুত্র দুইটী সঙ্গে লইয়া, কলিকাতায় আপনার ভ্রাতৃগণের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। মাতুলাশ্রয়েই ডাক্তার সরকার মহাশয়ের শিক্ষা আরব্ধ হয়। প্রথম বয়সে মাতুল পরিবারে তিনি যে উপকার লাভ করিয়াছিলেন, তাহা তিনি কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করিতেন। প্রথমে কিছুদিন একটী বাঙ্গালা পাঠ-শালায় শিক্ষালাভ করিয়া, তিনি ৺ঠাকুরদাস দেব নামক তাঁহাদিগের প্রতিবাসী কোন ভদ্রলোকের নিকট ইংরাজী পড়িতে আরম্ভ করেন। তিনি যতদিন জীবিত ছিলেন, ডাক্তার সরকার মহাশয় তাঁহাকে আন্তরিক শ্রদ্ধা ও সম্মান করিতেন। ঠাকুরদাস বাবুর পরিবারস্থ ব্যক্তিগণকে তিনি আজীবন আত্ম-পরিবারভুক্ত ব্যক্তিগণের ন্যায় স্নেহ করিয়া আসিয়াছেন।

আনুমানিক ৭ বৎসর বয়সের সময় সরকার মহাশয় অধ্যয়নার্থ হেয়ার স্কুলে প্রবেশ করেন। মহাত্মা হেয়ার তখন জীবিত ছিলেন। স্বর্গীয় উমাচরণ মিত্র সেই সময় হেয়ার স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন এবং খ্যাতনামা ডাক্তার দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি এখানে অধ্যাপনা করিতেন। উমাচরণ বাবুর আবৃত্তি-প্রণালী অতি অপূর্ব্ব ছিল। অবকাশ-কালে বা স্বশ্রেণীতে অধ্যাপনের সময় তিনি যখন সেক্সপিয়ার, মিল্টন্ প্রভৃতির গ্রন্থ হইতে কোন অংশ আবৃত্তি করিতেন, ডাক্তার সরকার মহাশয়

নিম্নশ্রেণী হইতে তদ্গতচিত্তে তাহা শ্রবণ করিতেন। পঠিত অংশের অর্থ বুঝিতে না পারিলেও, পুনঃ পুনঃ তাহা শ্রবণ করিতে তাঁহার ইচ্ছা হইত এবং নিজের নিম্নশ্রেণীর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাঠ্যপুস্তক তিনি উমাচরণ বাবুর অনুকরণে পাঠ করিতে চেষ্টা করিতেন। এই সময় হইতেই সেক্সপিয়ার ও মিল্টনের প্রতি তাঁহার আজীবনব্যাপী অনুরাগ উদ্ভূত হয়। যাঁহারা ডাক্তার সরকারের বক্তৃতা শ্রবণ করিয়াছেন, তাঁহারা একবাক্যে তাঁহার উচ্চারণ প্রণালীর প্রশংসা করিয়া থাকেন। বাল্যকাল হইতে উমাচরণ বাবুর অনুকরণে আবৃত্তি সম্বন্ধে মনোযোগ করাতেই তিনি এই গুণ লাভ করিয়াছিলেন। হেয়ার স্কুলে অধ্যয়নের সময়ই তিনি একজন বিশেষ মেধাবী ছাত্র বলিয়া পরিচিত হন; শিক্ষকগণ তাঁহার ব্যবহারে আন্তরিক সন্তুষ্ট ছিলেন। তাঁহার হেয়ার স্কুলের সহপাঠীদিগের মধ্যে প্রসিদ্ধ নাটককার স্বর্গীয় দীনবন্ধু মিত্রের নাম উল্লেখযোগ্য।

উমাচরণ বাবুর পর (Mr. Twentyman) মিষ্টার টোয়েন্‌টীম্যান্ নামক একজন সাহেব হেয়ার স্কুলের প্রধান শিক্ষক নিযুক্ত হন। ডাক্তার সরকার তাঁহার বিশেষ প্রিয়-পাত্র ছিলেন। মিঃ টোয়েন্‌টীম্যান্ অনেক সময় তাঁহার লিখিত অনুশীলন এবং রচনা সগৌরবে উচ্চ শ্রেণীর ছাত্র-দিগকে পাঠ করিয়া শুনাইতেন। ১৮৪৮।৪৯ খৃষ্টাব্দে ডাক্তার সরকার, হেয়ার স্কুল হইতে জুনিয়ার স্কলারশিপ্

বৃত্তি প্রাপ্ত হইয়া, হিন্দু কলেজে প্রবেশ করেন। সে বৎসরের পরীক্ষায় তিনিই প্রথম হইয়াছিলেন। সুপরিচিত নামা সাট্‌ক্লিফ্ সাহেব তখন হিন্দু কলেজের অন্যতম শিক্ষক ছিলেন। তিনি ডাক্তার সরকারকে বিশেষ স্নেহ করিতেন এবং মিষ্টার টৌয়েন্‌টীম্যানের ন্যায় তিনিও তাঁহার লিখিত প্রশ্নের উত্তরসমূহ আপনার বন্ধুদিগকে দেখাইতেন। হিন্দুকলেজ তখন বঙ্গদেশের মধ্যে একটী অত্যুৎকৃষ্ট বিদ্যালয় বলিয়া পরিচিত ছিল; সুতরাং ডাক্তার সরকার মেডিকেল কলেজে প্রবেশের পূর্ব্বে এদেশে সাহিত্য ইতিহাস প্রভৃতি বিষয়ে যতদূর উচ্চশিক্ষা প্রাপ্ত হওয়া সম্ভব, তাহা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই উচ্চশিক্ষার গুণেই তিনি জীবনে এত উন্নতি করিতে এবং পরিণামে চিকিৎসা ব্যবসায়ী হইয়াও, বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্টস্ ফ্যাকল্টীর সভাপতি হইতে পারিয়াছিলেন। ডাক্তার সরকারের হিন্দুকলেজের সহাধ্যায়িগণের মধ্যে স্বনামপ্রসিদ্ধ বিচারপতি স্বর্গীয় দ্বারকানাথ মিত্রের নাম উল্লেখযোগ্য। উভয়েই কলেজের মধ্যে বিশেষ প্রতিভাবান্ ছাত্র বলিয়া পরিচিত ছিলেন এবং উত্তরকালে উভয়ের মধ্যে প্রগাঢ় বন্ধুতা সঞ্জাত হইয়াছিল। ডাক্তার সরকার বিজ্ঞানসভার উদ্যোগ করিলে দ্বারকানাথ বাবু তাহাতে বিশেষ উৎসাহ প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং স্বয়ং এক হাজার টাকা চাঁদা স্বাক্ষর করিয়াছিলেন। হিন্দুকলেজে পাঠাবস্থায় ডাক্তার সরকার একটী

অসাধারণ গুণ লাভ করিয়াছিলেন। বাঙ্গালীদিগের মধ্যে তিনি একজন বিশেষ অধ্যয়নশীল ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হন। আহার, নিদ্রা প্রভৃতির সময় বাদ দিলে তাঁহাকে অতি অল্পক্ষণই পুস্তকবিরহিত দেখিতে পাওয়া যাইত। নিজের ব্যবসায়সংশ্লিষ্ট পুস্তক ব্যতীত অন্যান্য এত গ্রন্থ তিনি পাঠ করিয়াছিলেন যে, বাঙ্গালীদের মধ্যে অতি অল্প লোককেই তাঁহার সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। হিন্দুকলেজ হইতে এই অধ্যয়নাসক্তি তাঁহার হৃদয়ে সঞ্জাত হয়। সাহিত্য, ইতিহাস, বিজ্ঞান, দর্শন, ধর্ম্মতত্ত্ব প্রভৃতি বিবিধ বিষয়ক প্রচুর গ্রন্থ তিনি এই সময় পাঠ করিয়াছিলেন। বাল্যজাত এই অধ্যয়নস্পৃহা ক্রমে তাঁহার এরূপ প্রকৃতিগত হইয়া দাঁড়াইয়াছিল যে, রোগশয্যায় শয়ন করিয়াও তিনি অধ্যয়ন হইতে নিবৃত্ত থাকিতে পারিতেন না।

ডাক্তার সরকার হিন্দুকলেজ হইতে সিনিয়ার বৃত্তি লাভ করিয়া, ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে মেডিকেল কলেজে প্রবেশ করেন। মেডিকেল কলেজে তখন ডাঃ ফেরার, পার্ট্রিজ, গুডিভ্ প্রভৃতি অনেক খ্যাতনামা অধ্যাপক অধ্যাপনা করিতেন। ডাক্তার সরকার ইঁহাদিগের সকলেরই, বিশেষতঃ চক্ষুরোগ চিকিৎসক ডাক্তার আর্চার এবং প্রসিদ্ধনামা ডাক্তার ফেরারের একান্ত স্নেহভাজন হইয়াছিলেন। মেডিকেল কলেজে তিনি একজন বিশেষ প্রতিষ্ঠাভাজন ছাত্র ছিলেন। শারীর-বিদ্যা, উদ্ভিদ্-বিদ্যা, ভৈষজ্য এবং ধাত্রীবিদ্যা প্রভৃতি বিবিধ বিষয়ে তিনি

বৃত্তি ও স্বর্ণপদক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। হিন্দু কলেজে রীতিমত শিক্ষালাভ করিয়া যাওয়াতে, মেডিকেল কলেজে সাধারণ শিক্ষার্থী ছাত্রদিগের অপেক্ষা তাঁহার অনেক বিষয়ে সুবিধা হইয়াছিল। যে সকল বিষয় বুঝিতে হইলে গণিত ও বিজ্ঞানের সাহায্য আবশ্যক, তাহা তিনি অপেক্ষাকৃত অল্পায়াসে বুঝিতে পারিতেন। তাঁহার ছাত্রাবস্থার একটী গল্প নিম্নে প্রদত্ত হইল। কলেজের তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে অধ্যয়নের সময়, একবার তিনি তাঁহার কোন পীড়িত আত্মীয়কে লইয়া চক্ষুরোগ চিকিৎসার স্থানে গমন করেন। তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে চক্ষু রোগের চিকিৎসা শিক্ষা দেওয়া হইত না। ডাক্তার আর্চার পঞ্চম বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্রদিগকে লইয়া চক্ষুতত্ত্ব-ঘটিত আণুবীক্ষণিক শরীরতত্ত্ব (Microscopic anatomy of the eye) সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছিলেন। প্রায় কোন ছাত্রই তাঁহার প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিতেছিলেন না। হঠাৎ ডাক্তার সরকারের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে, তিনি ডাঃ আর্চারের একটী প্রশ্নের উত্তর দিলেন। ডাঃ আর্চার তাঁহাকে আরও কয়েকটী প্রশ্ন করিলেন, এবং তাঁহার নিকট সন্তোষজনক উত্তর প্রাপ্ত হইয়া ও ডাক্তার সরকার যে তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র তাহা অবগত হইয়া, একান্ত বিস্মিত ও প্রীত হইলেন। এই দিন হইতে ডাক্তার আর্চার সরকার মহাশয়কে আন্তরিক স্নেহ করিতে আরম্ভ করিলেন। পঞ্চম বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্রেরা পরে ডাক্তার সরকারকে কথায়

কথায় বলেন যে, আলোক-বিজ্ঞান (Light) সম্বন্ধে উপযুক্ত শিক্ষার অভাবেই তাঁহারা চক্ষু রোগের চিকিৎসা প্রণালী বুঝিতে পারিতেছেন না। তিনি যদি আলোক-বিজ্ঞান সম্বন্ধে তাঁহাদিগকে উপদেশ দেন, তাহা হইলে বিশেষ উপকার হয়। ডাক্তার সরকার তাঁহাদিগের প্রস্তাবে সম্মত হইলেন এবং কলেজের অধ্যক্ষের অনুমতি গ্রহণ করিয়া "আলোক" সম্বন্ধে কয়েকটী বক্তৃতা করিলেন। সেই বৎসরেই তিনি "Adaptation of the human eye to distance" নামে একটী বক্তৃতা করেন। ইহাই প্রকৃত প্রস্তাবে তাঁহার বৈজ্ঞানিক বক্তৃতা সমূহের প্রথম। তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র হইয়া পঞ্চম বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্রদিগকে উপদেশ প্রদান করা বড় সাধারণ ক্ষমতার পরিচায়ক ও অল্প গৌরবের বিষয় নহে। কিন্তু যাঁহারা ভাবী জীবনে কোনরূপ মহত্ব প্রদর্শন করেন, তরুণ বয়সে তাঁহাদিগের প্রকৃতিতে এইরূপ অনন্যসুলভ শক্তি প্রায়ই লক্ষিত হইয়া থাকে। মেডিকেল কলেজের শেষ পরীক্ষায় ডাক্তার সরকাব প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। সুপরিচিত নামা স্বর্গীয় ডাক্তার জগবন্ধু বসু ও তিনি এক সঙ্গে ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে এম, ডি, উপাধি লাভ করেন। এই পরীক্ষায় ডাক্তার সরকার প্রথম এবং জগবন্ধু বাবু দ্বিতীয় হইয়াছিলেন।

মেডিকেল কলেজ হইতে উত্তীর্ণ অন্যান্য ছাত্রের ন্যায় ডাক্তার সরকারও প্রথমে য়্যালোপ্যাথি-মতে চিকিৎসা কার্য্যে

প্রবৃত্ত হন। কলেজ হইতে প্রতিষ্ঠার সহিত বহির্গত হওয়াতে এবং কলেজের অধ্যাপকগণের আস্থা-ভাজন হওয়াতে, অল্পদিনের মধ্যেই ব্যবসায়ে তাঁহার উন্নতি লক্ষিত হইয়াছিল। ডাক্তার ফেরার তাঁহাকে এরূপ স্নেহ করিতেন যে, Bengal Branch of the British Medical Association নামক সভা প্রতিষ্ঠার সময় বয়োজ্যেষ্ঠ অনেক য়ুরোপীয় ডাক্তারকেও পরিত্যাগ করিয়া তিনি তাঁহাকে উদ্যোগ-সভার সভাপতি করেন। সভা প্রতিষ্ঠিত হইলে ডাক্তার সরকার প্রথম কয়েক বৎসর তাহার সম্পাদকত্ব করিয়া পরে তাহার ভাইস্ প্রেসিডেণ্ট্ হইয়াছিলেন।

হোমিওপ্যাথি তখন এদেশে সম্পূর্ণ নূতন ছিল। ডাক্তার (Berigny) বেরিণী অল্পদিন মাত্র এদেশে আসিয়াছিলেন। বাঙ্গালীর মধ্যে কেবল ওয়েলিংটন স্কোয়ারের দত্ত পরিবারস্থ স্বর্গীয় বাবু রাজেন্দ্র দত্তই হোমিওপ্যাথির অলোচনা করিতেন; এবং তাঁহার দ্বারা চিকিৎসিত হইয়া উপকার লাভ করাতে বিদ্যাসাগর মহাশয়ও হোমিওপ্যাথিতে শ্রদ্ধাবান্ হইয়াছিলেন। তাঁহারা উভয়েই ডাক্তার সরকারকে হোমিওপ্যাথির আলোচনার জন্য অনুরোধ করিতেন। কিন্তু তিনি তাঁহাদের কথায় কর্ণপাত করা দূরে থাকুক্, বরং তাঁহাদিগকে অবৈজ্ঞানিক মতের সমর্থক বলিয়া উপহাস করিতেন। ব্রিটিস্ মেডিকেল য়্যাসোসিয়েসনের প্রথম অধিবেশনে তিনি হোমিওপ্যাথির সম্বন্ধে অনেক

উপহাস ও কটূক্তি পর্য্যন্ত করিয়াছিলেন। এই সময় Morgan's Philosophy of Homeopathy নামক গ্রন্থ সমালোচনার জন্য তাঁহার হস্তগত হয়। ডাক্তার সরকারের মন হোমিওপ্যাথির প্রতি এরূপ বিদ্বেষ ভাবাপন্ন ছিল যে, তিনি পুস্তকখানি পাইবামাত্র বলিলেন, "ইহা ত বিজ্ঞানমূলক নয়, এই মুহূর্ত্তেই ইহার সমালোচনা করিয়া দিতেছি।" কিন্তু তিনি যতই পুস্তক খানি পাঠ করিতে লাগিলেন, ততই বুঝিতে পারিলেন যে, হোমিওপ্যাথি অযুক্তিমূলক এবং অবৈজ্ঞানিক নহে; তাহার মূলে সত্য নিহিত আছে। ইহারই সমকালে রাজেন্দ্র বাবুর চেষ্টায় কতকগুলি উৎকট রোগ হোমিওপ্যাথি চিকিৎসায় আরোগ্য হয়, ইহা তিনি দেখিতে পান। তাঁহার নিজের মাতুলও কঠিন শূল বেদনা হইতে রাজেন্দ্র বাবুর চেষ্টায় নিষ্কৃতি লাভ করেন। তখন আর অবিশ্বাসের কারণ রহিল না। ক্রমে তিনি যতই হোমিওপ্যাথি সম্বন্ধে অনুসন্ধান ও আলোচনা করিতে লাগিলেন, ততই তাঁহার বিশ্বাস দৃঢ়ীভূত হইতে লাগিল। অবশেষে ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে ব্রিটিস্ মেডিকেল সভায় প্রদত্ত একটি বক্তৃতায়, তিনি, হোমিওপ্যাথি যে যুক্তিমূলক এবং তিনি নিজে যে ইহাতে আস্থাবান্, ইহা সাধারণের সমক্ষে ব্যক্ত করিলেন। তাঁহার সমব্যবসায়ী এবং আত্মীয়-গণের মধ্যে এই বক্তৃতায় বিশেষ আন্দোলন উপস্থিত হইল। অপ্রচলিত এবং উপহাসার্হ মতের পরিপোষক হইয়া তিনি

নিজের ভাবী উন্নতির মূলে কুঠারাঘাত করিলেন, অনেকেই এইরূপ বলিতে লাগিলেন। ডাক্তার ফেরার ছাত্রাবস্থা হইতে সরকার মহাশয়কে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন; এক দিন সাক্ষাৎ হইলে তিনি তাঁহাকে সস্নেহে বলিলেন,—"সরকার, তুমি একি করিতেছ, তুমি ব্যবসায়ে নূতন প্রবৃত্ত হইয়াছ, ইহাতে তোমার কি ক্ষতি হইবে, তাহা কি তুমি বুঝিতে পারিতেছ না?" ডাক্তার সরকার তাঁহাকে বিনীতভাবে বলিলেন, "ব্যবসায়ে আমার ক্ষতি হইতে পারে; কিন্তু যখন হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা প্রকৃষ্টতর বলিয়া আমার বিশ্বাস জন্মিয়াছে, তখন তাহার সমর্থন এবং অবলম্বন না করিলে আমার পক্ষে অন্যায় কার্য্য হইবে।" ডাক্তার ফেরার বলিলেন,—"এ কথার উপর আমার কোন কথা নাই; কিন্তু এখনও বিবেচনা করিয়া দেখ, অগ্রপশ্চাৎ না ভাবিয়া কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইও না।" এইরূপ আরও অনেকে স্পষ্টভাবে এবং ইঙ্গিতে তাঁহাকে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা হইতে নিবৃত্ত হইতে পরামর্শ দিলেন। কিন্তু ডাক্তার সরকার তাহাতে বিচলিত হইলেন না। সত্য প্রচার করিতে যাইয়া নিজের অদৃষ্টে যাহা হয় হইবে, এইরূপ স্থির করিয়া তিনি হোমিওপ্যাথি মতে চিকিৎসা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ভগবানের কৃপায় তিনি ক্ষতিগ্রস্ত হইলেন না। তিনি যেমন হোমিওপ্যাথিকে রক্ষা করিয়াছেন, হোমিওপ্যাথিও তেমনই তাঁহাকে রক্ষা করিয়াছে।

তাঁহার পূর্ব্বে রীতিমত চিকিৎসাশাস্ত্রে অভিজ্ঞ অপর কোন ব্যক্তি এদেশে হোমিওপ্যাথির আলোচনা করেন নাই। হোমিওপ্যাথি যে হাতুড়িয়া চিকিৎসা নহে, ইহা তিনিই প্রতিপাদন করিয়াছেন। এদেশে হোমিওপ্যাথির প্রচারের জন্য স্বর্গীয় রাজেন্দ্র দত্তের, তাঁহার এবং বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নাম স্মরণীয় হইবে।

চিকিৎসা সম্বন্ধে ডাক্তার সরকার মহাশয় যে প্রতিষ্ঠা এবং সুযশ লাভ করিয়াছিলেন, তাহা উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন। তাঁহার সমকালবর্ত্তী চিকিৎসকদিগের মধ্যে তিনি একজন অগ্রগণ্য। সার রিচার্ড গার্থ ও অনারেবল্ গিবস্ এর ন্যায় সম্ভ্রান্ত ও উচ্চপদস্থ ইংরাজ, এবং বঙ্গদেশের শীর্ষস্থানীয় কত রাজা মহারাজ তাঁহার চিকিৎসায় উপকার লাভ করিয়াছেন। তিনি গৃহে দরিদ্রদিগের জন্য দাতব্য চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন। তাঁহার নামে আকৃষ্ট হইয়া কোন কোন দিন দুইশতেরও অধিক রোগী তাঁহার দ্বারে সমাগত হইয়াছে। সুস্থাবস্থায় তিনি প্রাতে ৬টা হইতে ১০টার পর পর্য্যন্তও নিজে বসিয়া তাহাদিগকে ব্যবস্থা দিয়াছেন এবং ঔষধ বিতরণ করিয়াছেন। তিনি উগ্র-প্রকৃতি ও কটুভাষী চিকিৎসক বলিয়া কাহারও কাহারও নিকট পরিচিত; কিন্তু উগ্রতাই তাঁহার প্রকৃতি নহে। রোগী হইয়া চিকিৎসকের ব্রত গ্রহণ করিতে আসিলেই তিনি বিরক্ত হইতেন। তিনি বলিতেন,—"রোগী চিকিৎস-

কের নিকট আপনার প্রকৃতি, শারীরিক অবস্থা, রোগের লক্ষণ সমস্তই বলিতে পারেন, কিন্তু 'এ ঔষধ না দিয়া ও ঔষধ দেওয়া যায় কি না, এটা আহার করিলে কি ক্ষতি?' এরূপ প্রশ্ন করিবার তাঁহার অধিকার নাই। চিকিৎসা এবং পথ্য, সকল বিষয়ে সম্পূর্ণরূপে চিকিৎসকের উপর নির্ভর করাই তাঁহার কর্ত্তব্য।" এ সম্বন্ধে তিনি নিম্নলিখিত গল্পটী বলিয়াছেন :—

"একবার কোন পীড়িতা ইংরাজ মহিলা চিকিৎসার জন্য তাঁহার স্বামীর সঙ্গে আমার নিকট আসিয়াছিলেন। মহিলাটী বাতরোগে বিকলাঙ্গ ও চলচ্ছক্তি-রহিত হইয়া কষ্ট পাইতেছিলেন। চিকিৎসার ক্রটী হয় নাই; জল-বায়ু পরিবর্ত্তনের দ্বারা উপকার হইবে, এই আশায় তাঁহার স্বামী তাঁহাকে অষ্ট্রেলিয়া পর্য্যন্ত লইয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় নাই; শেষে নিরাশ হইয়া আমার নিকট আসিয়াছিলেন। আমি সমস্ত অবস্থা শুনিয়া, পীড়িতা মহিলাটীকে বলিলাম, "আমার দ্বারা আপনার চিকিৎসার সুবিধা হইবে না। আমি যে ব্যবস্থা করিব, আপনি তদনুসারে চলিতে পারিবেন না।" পীড়িতা এবং তাঁহার স্বামী কাতরস্বরে বলিলেন, "সে কি? আমরা যখন আপনার নিকট আসিয়াছি, তখন সম্পূর্ণরূপেই আপনার মতে চলিব, তাহাতে সন্দেহ নাই।" আমি মহিলাটীকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনি কি আহার

করেন ?" তিনি মাংস, ডিম্ব ও পিষ্টকাদির নাম করিলেন। আমি বলিলাম, "এ সকলের কিছুই হইবে না। সাত দিন কেবল চাপাটী (একপ্রকার রুটী) এবং মুগের ডাল খাইয়া থাকিতে হইবে, তাহার পর বুঝিয়া ঔষধ দিব।" মহিলাটী বলিলেন, "হায়! তাহা হইলে আমি মারা যাইব।" আমি বলিলাম, "আমি ত পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আমার ব্যবস্থায় আপনার সুবিধা হইবে না। আমি চিকিৎসা করিলে এই রূপই করিব। এখন আপনার যেরূপ ইচ্ছা করিতে পারেন।" মহিলাটী অগত্যা স্বীকৃতা হইয়া গেলেন। সাত দিন পরে যখন তিনি ফিরিয়া আসিলেন, তখন তাঁহার শরীর অনেক সুস্থ। স্বামীর স্কন্ধে ভর দিয়া তিনি নিজে উপরে আসিলেন এবং আনন্দের সহিত বলিলেন যে, আমার ব্যবস্থায় তাঁহার অনেক উপকার হইয়াছে। আমি বলিলাম, "উত্তম! আর সাত দিন ঐরূপে চলুন।" মহিলাটী বলিলেন, "সেকি! আমাকে ঔষধ দিবেন না, কেবল এই রূপে রাখিবেন?" আমি বলিলাম, "না, আপাততঃ এইরূপ চলুন, পরে ঔষধের বিষয় বিবেচনা করিব।" মাসাধিককাল এইরূপ ব্যবস্থার এবং আহারাদির সামান্য পরিবর্ত্তন দ্বারা মহিলাটী ক্রমশঃ সম্পূর্ণ সুস্থ হইলেন। বিদায়-গ্রহণের দিন কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া শেষে বলিলেন, "ডাক্তার! আমার দুঃখ এই যে আমাকে একবিন্দু ঔষধ না দিয়া আপনি আমায় আরোগ্য করিলেন।" (Doctor! I am sorry you have cured

me without a drop of medicine). ডাক্তার সরকার বলিতেন,—"চিকিৎসকের উপর এইরূপ আস্থা.এবং সম্পূর্ণ নির্ভর করাই কর্ত্তব্য। ইহা না করিলে চিকিৎসককে ডাকিয়া তাঁহার প্রতি কৃপা-প্রদর্শনের আবশ্যকতা নাই।"

য়্যালোপ্যাথি-মতের চিকিৎসা হইতে ডাক্তার সরকার কিরূপে হোমিওপ্যাথি-মতে চিকিৎসা কার্য্যে প্রণোদিত হইয়াছিলেন, আমরা তাহার উল্লেখ করিয়াছি। সত্যানুরাগ এবং বিশ্বাসের জন্য যাঁহারা ধর্ম্মমত পরিবর্ত্তন করেন, তাঁহাদিগকে যে নির্য্যাতন ভোগ করিতে হয়, ইহা সকলেরই পরিচিত। ডাক্তার সরকারকেও চিকিৎসা বিষয়ে মত পরিবর্ত্তনের জন্য বহু ক্লেশ সহ্য করিতে হইয়াছিল।

যিনি স্বদেশীয়দিগের মধ্যে বিজ্ঞান-চর্চ্চার জন্য সর্ব্বাপেক্ষা অধিক চেষ্টা এবং সর্ব্বাপেক্ষা অধিক স্বার্থত্যাগ করিয়াছেন, কিরূপে তাঁহার নিজের চিত্ত বিজ্ঞানের দিকে আকৃষ্ট হইয়াছিল, তাহা অবগত হইতে সকলেরই কৌতূহল হওয়া স্বাভাবিক। বাল্যকাল হইতেই ডাক্তার সরকারের প্রকৃতি অনুসন্ধানেচ্ছু ও কৌতূহল-পরবশ ছিল। প্রত্যেক ঘটনার কার্য্য-কারণ-সম্বন্ধ নির্ণয় করিতে তিনি সর্ব্বদাই অগ্রসর হইতেন। হিন্দু কলেজে অধ্যয়নের সময় তিনি তৎকালপ্রচলিত কোন কোন বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ পাঠ করিয়াছিলেন। একদিন তাঁহার কনিষ্ঠ মাতুল মহাশয় রেভারেণ্ড্ মিল্‌নারের Tour through Creation নামক একখানি

পুস্তক পাঠের জন্য আনয়ন করেন। ইহাতে নানাবিধ বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব আলোচিত ছিল। ডাক্তার সরকার তাঁহার স্বাভাবিক অধ্যয়ন-স্পৃহার সহিত পুস্তকখানি পাঠ ও আয়ত্ত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। যতই তিনি পাঠ করিতে লাগিলেন, ততই তাঁহার কৌতূহল বর্দ্ধিত ও জ্ঞানলালসা উদ্দীপিত হইতে লাগিল। সৃষ্ট পদার্থ সমূহের বহুত্ব ও বিশালত্ব এবং জগৎস্রষ্টার অনুপমশক্তি ও কৌশল চিন্তা করিয়া, তাঁহার তরুণ হৃদয় বিস্ময়ে অভিভূত হইল। পুস্তক খানির এক স্থলে সূর্য্য সম্বন্ধে সার উইলিয়াম হার্সেলের মত উদ্ধৃত করিয়া লিখিত ছিল যে, "আমাদিগের বাসভূমি এই পৃথিবী যেমন সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করিতেছে, তেমনই এই গ্রহ, উপগ্রহ সম্বলিত সৌরজগৎ অন্য কোন বৃহত্তর সূর্য্যের এবং তাহাও হয়ত অপর কোন মহাসূর্য্যের চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করিতেছে।" ডাক্তার সরকার মহাশয় বলেন, "যখন আমি এই অংশটী পাঠ করিলাম, তখন আমার মনের ভাব যে কিরূপ হইয়াছিল, তাহা এক্ষণে প্রকাশ করিবার আমার সাধ্য নাই। আমার মনে হইল, জগত্তত্ত্বের একটী গূঢ় রহস্য আমার নিকট সহসা প্রকাশিত হইল। সূর্য্য যদি বৃহত্তর সূর্য্যের এবং তাহাও যদি তদপেক্ষা আরও বৃহৎ কোন সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করে, তবে এই সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড হয়ত সেই অনন্তশক্তি, মহামহিমাময় জগৎ-স্রষ্টার সিংহাসনের চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতেছে। ভাবের

উচ্ছ্বাসে আমি নির্ব্বাক হইলাম এবং মনের সেই অবস্থায় নগ্নপদে ও নগ্নদেহে মাতুল মহাশয়দিগের গৃহ হইতে লেবু-তলার গির্জ্জা পর্য্যন্ত অনবরত পাদচারণ করিতে লাগিলাম। আমাকে সে অবস্থায় দেখিলে লোকে বায়ুরোগগ্রস্ত বলিয়া মনে করিত। সেই দিন হইতে বিজ্ঞানের প্রতি আমার যে অনুরাগ এবং বিজ্ঞানের সাহায্যে জগৎস্রষ্টার মহিমা অবগত হইবার জন্য আমার যে আকাঙ্ক্ষা জন্মিয়াছে, তাহা একদিনের জন্যও হ্রাসপ্রাপ্ত হয় নাই।"

বিজ্ঞান শিক্ষার সুবিধা হইবে ভাবিয়াই ডাক্তার সরকার মেডিকেল কলেজে প্রবেশ করিয়াছিলেন। কলেজ ত্যাগের পর হইতে শেষ বয়স পর্য্যন্ত তিনি সাধ্যানুসারে বিজ্ঞানানু-শীলনে নিযুক্ত ছিলেন। কোন স্থানে বিজ্ঞানের চর্চ্চা হইতেছে দেখিলে, তিনি আনন্দলাভ করিতেন। বিজ্ঞান-সভা প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্ব্বে তিনি সেণ্ট্ জেভিয়ার্স কলেজে পাঁচশত টাকা মূল্যের যন্ত্রাদি দান করিয়াছিলেন। তাঁহার বাল্যলব্ধ বিজ্ঞানানুরাগের ফল "ভারতবর্ষীয় বিজ্ঞান সভা"। ইহাই তাঁহার জীবনের শ্রেষ্ঠতম কার্য্য এবং ইহারই জন্য তাঁহার নাম চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দের ৩রা জানুয়ারি বিজ্ঞান সভার অনুষ্ঠান পত্র প্রথম প্রচারিত হয়, এবং ছয় বৎসরের অবিশ্রাম চেষ্টা ও পরিশ্রমের পর ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দের ১৯এ জুলাই ইহা প্রকাশ্য-ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। বঙ্গের তাৎকালীন লেফ্টেনাণ্ট গবর্ণর

সার রিচার্ড টেম্পল্ প্রতিষ্ঠা-সভার সভাপতি ছিলেন এবং কলিকাতার প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ সভাস্থলে উপস্থিত থাকিয়া প্রতিষ্ঠা-কার্য্যে সহায়তা করিয়া ছিলেন। বিজ্ঞান সভার প্রথম সুহৃদ্ ও উৎসাহদাতৃগণের মধ্যে ডাক্তার সরকার স্বর্গীয় কৃষ্ণদাস পাল মহাশয়ের নাম সর্ব্বাপেক্ষা কৃতজ্ঞতার সহিত উল্লেখ করিতেন।

বিজ্ঞান সভার প্রতিষ্ঠা করিয়া ডাক্তার সরকার যেমন তাঁহার মস্তিষ্কবত্তার পরিচয় দিয়াছেন, বৈদ্যনাথের নিরাশ্রয় কুষ্ঠ রোগীদিগের জন্য আশ্রয় নির্ম্মাণ করিয়া দিয়া, তিনি তেমনি তাঁহার হৃদয়বত্তার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। বৈদ্যনাথের কৃপায় পীড়া আরোগ্য হইবার আশায় ভারতবর্ষের নানা স্থান হইতে কুষ্ঠ রোগিগণ বৈদ্যনাথে আসিয়া থাকে। আশ্রয়ের অভাবে ইহাদিগকে পূর্ব্বে মর্ম্মান্তিক ক্লেশে কালযাপন করিতে হইত। বৃক্ষতলে, নদীতীরে বা রাজপথে তাহাদিগকে শীত,গ্রীষ্ম, বর্ষা সব সময় বাস করিতে হইত, এবং অনেক হতভাগ্য সেই অবস্থায় শৃগাল, কুক্কুরের দংশন সহ্য করিয়া প্রাণত্যাগ করিত। বৈদ্যনাথপ্রবাসী স্বর্গীয় রাজনারায়ণ বসু এবং বৈদ্যনাথ মন্দিরের অন্যতম পুরোহিত স্বর্গীয় গিরিজানন্দ দত্তঝা প্রভৃতি স্থানীয় কয়েকজন ভদ্রলোক কুষ্ঠ রোগীদিগের জন্য একটি গৃহ নির্ম্মাণের উদ্যোগী ছিলেন। ডাক্তার সরকার তাঁহাদিগের মধ্যে একজনের নিকট সমস্ত অবস্থা অবগত হইয়া, এবং দুই

হাজার টাকা হইলে একটী গৃহ নির্ম্মিত হইতে পারে শুনিয়া নিজেই এই টাকা প্রদান করিতে স্বীকার করিয়াছিলেন। ১৮৯২ সালের জুলাই মাসে সার চার্‌ল্‌স্ ইলিয়ট্ এই গৃহের ভিত্তি স্থাপন করেন এবং ১৮৯৫ সালের আগষ্ট মাসে দ্বারবঙ্গের মহারাজা কর্ত্তৃক ইহা প্রকাশ্যভাবে উন্মুক্ত হয়। ডাক্তার সরকার প্রথমে ২০০০৲ টাকা দিতে স্বীকৃত হইয়াছিলেন, কিন্তু ক্রমে পাঁচ হাজার টাকা ব্যয় করিয়া ২৪ জন রোগীর উপযুক্ত অতি সুন্দর দুইটী গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। হতভাগ্য কুষ্ঠ রোগিগণ এতদিন নিরাশ্রয় অবস্থায় আকাশতলে দিনপাত করিত, আজ তাহারা পরম সুখে সুন্দর অট্টালিকায় বাস করিতেছে। ডাক্তার সরকারের অভিপ্রায় অনুসারে এবং দেওঘরবাসিদিগের সম্মতিক্রমে, এই গৃহ তাঁহার সহধর্ম্মিনীর নামানুসারে "বৈদ্যনাথ রাজকুমারী কুষ্ঠাশ্রম" নামে অভিহিত হইয়াছে।

নিজের ব্যবসায়েও ডাক্তার সরকার অনেক সময় যে উদারতা ও মহাপ্রাণতা প্রদর্শন করিতেন, তাহা তাঁহার সম প্রতিষ্ঠাবান্ চিকিৎসকদিগের মধ্যে দুর্ল্লভ। বন্ধু, বান্ধবদিগের কথা দূরে থাকুক, যাঁহারা বিজ্ঞান সভায় কখনও কিছু এককালীন দান করিয়াছেন, কেবল এইমাত্র সম্পর্কে, তিনি তাঁহাদিগের অনেকের নিকট এক কপর্দ্দকও গ্রহণ করিতেন না। কেহ প্রকৃতই বিপদ্‌গ্রস্থ এবং তাঁহার দ্বারা তাঁহার উপকার হইবার সম্ভাবনা বুঝিলে, ডাক্তার

সরকার সাধ্যানুসারে তাঁহার উপকার করিতে কখন পরাঙ্মুখ হইতেন না।

তাঁহার কার্য্য কেবল তাঁহার নিজের ব্যবসায়ের মধ্যে আবদ্ধ ছিল না। তিনি একাধারে চিকিৎসক, বক্তা এবং লেখক। রাজনীতি, শিক্ষা, সমাজ-সংস্কার, নানা বিষয়ে তিনি মাতৃভূমির সেবার জন্য, নিজের রসনা ও লেখনী নিয়োজিত করিয়াছিলেন। অবলম্বিত ব্যবসায়েও যেমন, বক্তৃতা শক্তিতে এবং লিপি কৌশলেও তেমনই, তিনি তাঁহার স্বদেশীয়দিগের মধ্যে একজন অগ্রগণ্য ব্যক্তি। তাঁহার সম্পাদিত চিকিৎসা সম্বন্ধীয় পত্রিকার প্রবন্ধসমূহ য়ুরোপীয় ও আমেরিকা দেশীয় চিকিৎসাবিষয়ক পত্রিকাসমূহে সাদরে উদ্ধৃত হইত।

নিজের বিদ্যা ও বুদ্ধিবলে ডাক্তার সরকার স্বদেশে ও বিদেশে যে সম্মান লাভ করিয়াছেন তাহা সাধারণের পক্ষে সুলভ নয়। বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে D. L. উপাধিতে ভূষিত করিয়াছিলেন। রাজপুরুষগণও তাঁহাকে সম্মানিত করিতে ত্রুটী করেন নাই; লর্ড রিপণ তাঁহাকে C. I. E. উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন।

নিরক্ষর সমাজে জন্মগ্রহণ করিয়া এবং প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে সংগ্রাম করিয়া এরূপ উন্নতি ও মর্য্যাদা-লাভ পৃথিবীর যে কোন দেশেই স্মরণীয় ও গৌরবজনক।

আমরা ডাক্তার সরকারের অনেক গুণের উল্লেখ করিয়াছি। কিন্তু যে গুণের জন্য তিনি তাঁহার স্বদেশীয়গণের

আদর্শস্বরূপ, তাহার আলোচনা করা হয় নাই। ইহা তাঁহার বিদ্যানুরাগ। সাধারণতঃ আমাদিগের দেশে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পরীক্ষা-দান সম্পূর্ণ হইলেই পাঠ সমাপ্ত হয়। নিজের অবলম্বিত ব্যবসায় সংশ্লিষ্ট কার্য্য এবং সংবাদপত্র পাঠ, ইহাতেই আমাদিগের অধিকাংশ শিক্ষিত ব্যক্তির সময় অতিবাহিত হয়। কিন্তু ডাক্তার সরকার ছাত্রাবস্থার ন্যায় চিরদিনই পূর্ণমাত্রায় শিক্ষার্থী ছিলেন। সাহিত্য, বিজ্ঞান, ইতিহাস, দর্শন, যে কোন বিষয়ে হউক, ইংরাজীতে কোন নূতন গ্রন্থ প্রকাশিত হইলে, তাহা ক্রয় এবং পাঠ না করিলে তিনি নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিতেন না। প্রবীণ বয়সে রীতিমত শিক্ষক রাখিয়া তিনি ফরাসী ও পারসীক ভাষা শিক্ষা করেন। নিজের জ্ঞান পিপাসা চরিতার্থ করিবার জন্য তিনি নিজের পুস্তকালয়ে প্রায় এক লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়াছিলেন। যে দেশে লক্ষপতির গৃহে একটী ভূগোলক বা একখানি মানচিত্র দুর্লভ, সে দেশে দরিদ্রের সন্তানের পক্ষে নিজের উপার্জ্জন হইতে পুস্তকালয়ের জন্য এক লক্ষ টাকা ব্যয় বড় সহজ কথা নয়। তাঁহার জ্ঞান-পিপাসা যে কিরূপ প্রবল, এই একটী মাত্র প্রমাণ হইতেই তাহা প্রতীত হইতে পারে। বিদ্যাসাগর মহাশয় ভিন্ন তাঁহার সহিত এদেশে এ বিষয়ে আর কাহারও তুলনা হয় না। তাঁহার বিদ্যানুরাগের সঙ্গে তাঁহার বিজ্ঞানের জন্য স্বার্থ-ত্যাগও উল্লেখযোগ্য। বিজ্ঞান সভার জন্য তিনি যে কিরূপ

আত্মবিসর্জ্জন করিয়াছিলেন, অতি অল্প লোকই তাহা অবগত আছেন। বিজ্ঞান সভায় উপদেশ দিতে প্রস্তুত হইবার জন্য তাঁহাকে অধ্যয়নে যে সময় ব্যয় করিতে হইত, তাহা নিজের ব্যবসায়ে নিয়োগ করিলে তিনি প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিতে পারিতেন। যেদিন তাঁহার বক্তৃতার দিন নির্দ্দিষ্ট থাকিত, সেদিন সহস্র মুদ্রা দিলেও তিনি চিকিৎসাকার্য্যে গমন করিতেন না।

ডাক্তার সরকারের কোন দোষের বিষয় আমরা এ পর্য্যন্ত উল্লেখ করি নাই। মানবজন্ম ধারণ করিয়া দোষশূন্য হওয়া সহজ নহে। তিনিও দোষবিরহিত ছিলেন না। স্বভাবতঃ, তাঁহার প্রকৃতি অতি উগ্র এবং অসহিষ্ণু ছিল; কুপিত হইলে তিনি আত্মসম্বরণ করিতে পারিতেন না। অপ্রিয়ভাষী না হইয়াও সে সত্য বলিতে পারা যায়, তাহা তিনি অনেক সময় বিস্মৃত হইতেন। সামান্য মিষ্টভাষণের অভাবে তিনি কোন কোন সময়ে লোকের মর্ম্মবেদনার কারণ হইয়াছেন এবং স্বাবলম্বনে অভ্যস্ত হওয়াতে তিনি অন্যের সহিত সম্মিলিত হইয়া কার্য্য করিতে পারিতেন না। কিন্তু তাঁহার প্রকৃতিতে গুণের ভাগ এত অধিক যে, তাহাদের সহিত তুলনায় এই সকল দোষ অতি সামান্য বলিয়াই বিবেচিত হয়। তাঁহার দোষ ছিল সত্য, কিন্তু স্বার্থ-পরতা, পরশ্রীকাতরতা, চাটুকারিতা প্রভৃতি নীচতার সম্পর্ক তাঁহাতে আদৌ ছিল না। বাহিরের রুক্ষ এবং

সহজ-কোপন স্বভাবের অভ্যন্তরে তাঁহার প্রকৃতিতে আত্মীয়-স্বজন এবং বন্ধুদিগের প্রতি অতি মধুর, স্নিগ্ধভাব লক্ষিত হইত। তাঁহার কোন বন্ধু তাঁহাকে একবার বলিয়াছিলেন, "আপনার প্রকৃতি নারিকেলের মত; বাহিরে কর্কশ আবরণ, কিন্তু অভ্যন্তরে মধুর সলিল।" বাস্তবিকও কথাটী ঠিক। দোষ, গুণ সমস্ত লইয়া মনে হয়, তাঁহার ন্যায় ব্যক্তি বাঙ্গালা দেশে এ পর্য্যন্ত অতি অল্পই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। প্রতিকূল অবস্থার সহিত তাঁহার সংগ্রাম, তাঁহার বিদ্যানুরাগ, তাঁহার স্বাবলম্বন, তাঁহার স্বার্থত্যাগ এবং তাঁহার তেজস্বিতা তাঁহার স্বদেশীয়গণের আদর্শস্বরূপ। ব্রাহ্মণেতর বংশে জন্মগ্রহণ করিলেও ব্রাহ্মণোচিত এই সকল গুণ তাঁহাতে প্রভূত পরিমাণে বিদ্যমান ছিল। ১৯০৪ খৃঃ অব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে ৭১ বৎসর বয়সে তিনি ইহলোক পরিত্যাগ করেন। তাঁহার হৃদয়ে ঈশ্বরে বিশ্বাস পূর্ণমাত্রায় ছিল। ঈশ্বরের নাম করিতে করিতেই তিনি মহানিদ্রার ক্রোড়ে বিশ্রাম লাভ করেন। ভগবান্ করুন, বঙ্গীয় যুবকগণ যেন তাঁহার প্রদর্শিত মার্গ অনুসরণ করিয়া স্বদেশ ও স্বজাতির মুখোজ্জ্বল করিতে পারেন।



বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

বঙ্কিমচন্দ্র

যে কালে বঙ্কিমের নবীনা প্রতিভা লক্ষ্মীরূপে সুধাভাণ্ড হস্তে লইয়া বাংলাদেশের সম্মুখে আবির্ভূতা হইলেন তখনকার প্রাচীন লোকেরা বঙ্কিমের রচনাকে সসম্মান আনন্দের সহিত অভ্যর্থনা করেন নাই।

সেদিন বঙ্কিমকে বিস্তর উপহাস, বিদ্রূপ, গ্লানি সহ্য করিতে হইয়াছিল। তাঁহার উপর একদল লোকের সুতীব্র বিদ্বেষ ছিল, এবং ক্ষুদ্র যে লেখকসম্প্রদায় তাঁহার অনু-করণের বৃথা চেষ্টা করিত, তাহারাই আপন ঋণ গোপন করিবার প্রয়াসে তাঁহাকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক গালি দিত।

আবার এখনকার যে নূতন পাঠক ও লেখকসম্প্রদায় উদ্ভূত হইয়াছেন তাঁহারাও বঙ্কিমের পরিপূর্ণ প্রভাব হৃদয়ের মধ্যে অনুভব করিবার অবকাশ পান নাই। তাঁহারা বঙ্কিমের গঠিত সাহিত্যভূমিতেই একেবারে ভূমিষ্ঠ হইয়াছেন, বঙ্কিমের নিকট যে তাঁহারা কতরূপে কতভাবে ঋণী তাহার হিসাব বিচ্ছিন্ন করিয়া লইয়া তাঁহারা দেখিতে পাইতেছেন না।

কিন্তু বর্ত্তমান লেখকের সৌভাগ্যক্রমে আমাদের সহিত যখন বঙ্কিমের প্রথম সাক্ষাৎকার হয়, তখন সাহিত্য প্রভৃতি-সম্বন্ধে কোনরূপ পূর্ব্বসংস্কার আমাদের মনে বদ্ধমূল হইয়া

যায় নাই এবং বর্ত্তমান কালের নূতন ভাব-প্রবাহও আমাদের নিকট অপরিচিত অনভ্যস্ত ছিল। তখন বঙ্গ-সাহিত্যের যেমন প্রাতঃসন্ধ্যা উপস্থিত, আমাদের সেইরূপ বয়ঃসন্ধি-কাল। বঙ্কিম বঙ্গসাহিত্যে প্রভাতের সূর্য্যোদয় বিকাশ করিলেন, আমাদের হৃদ্‌পদ্ম সেই প্রথম উদ্‌ঘাটিত হইল।

পূর্ব্বে কি ছিল এবং পরে কি পাইলাম, তাহা দুইকালের সন্ধিস্থলে দাঁড়াইয়া আমরা এক মুহূর্ত্তেই অনুভব করিতে পারিলাম। কোথায় গেল সেই অন্ধকার, সেই একাকার, সেই সুপ্তি, কোথায় গেল সেই বিজয়বসন্ত, সেই গোলেব-কাওলি, সেই বালক-ভুলানো কথা—কোথা হইতে আসিল এত আলোক, এত আশা, এত সঙ্গীত, এত বৈচিত্র্য! বঙ্গ-দর্শন যেন তখন আষাঢ়ের প্রথম বর্ষার মত "সমাগতো রাজবদুন্নত ধ্বনির্।" এবং মুষলধারে ভাববর্ষণে বঙ্গ-সাহিত্যের পূর্ব্ববাহিণী পশ্চিমবাহিনী সমস্ত নদী নির্ঝরিণী অকস্মাৎ পরিপূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়া যৌবনের আনন্দবেগে ধাবিত হইতে লাগিল। কত কাব্যনাটক, উপন্যাস, কত প্রবন্ধ, কত সমালোচনা, কত মাসিকপত্র, কত সংবাদপত্র বঙ্গভূমিকে জাগ্রত প্রভাতকলরবে মুখরিত করিয়া তুলিল। বঙ্গভাষা সহসা বাল্যকাল হইতে যৌবনে উপনীত হইল।

আমরা কিশোরকালে বঙ্গসাহিত্যের মধ্যে ভাবের সেই নবসমাগমের মহোৎসব দেখিয়াছিলাম; সমস্ত দেশ ব্যাপ্ত করিয়া যে একটি আশার আনন্দ নূতন হিল্লোলিত হইয়াছিল,

তাহা অনুভব করিয়াছিলাম ; সেইজন্য আজ মধ্যে মধ্যে নৈরাশ্য উপস্থিত হয়। মনে হয়, সেদিন হৃদয়ে যে অপরিমেয় আশার সঞ্চার হইয়াছিল, তদনুরূপ ফললাভ করিতে পারি নাই। সে জীবনের বেগ আর নাই। কিন্তু এ নৈরাশ্য অনেকটা অমূলক। প্রথম সমাগমের প্রবল উচ্ছ্বাস কখনও স্থায়ী হইতে পারে না। সেই নব আনন্দ, নবীন আশার স্মৃতির সহিত বর্ত্তমানের তুলনা করাই অন্যায়। বিবাহের প্রথম দিনে যে রাগিণীতে বংশীধ্বনি হয়, সে রাগিণী চিরদিনের নহে। সেদিন কেবল অবিমিশ্র আনন্দ এবং আশা, তাহার পর হইতে বিচিত্র কর্ত্তব্যমিশ্রিত দুঃখসুখ, ক্ষুদ্র বাধাবিঘ্ন, আবর্ত্তিত বিরহমিলন—তাহার পর হইতে গভীর গম্ভীরভাবে নানাপথ বাহিয়া নানা শোকতাপ অতিক্রম করিয়া সংসারপথে অগ্রসর হইতে হইবে, প্রতিদিন আর নহবৎ বাজিবে না। তথাপি সেই একদিনের উৎসবের স্মৃতি কঠোর কর্ত্তব্যপথে চিরদিন আনন্দ সঞ্চার করে।

বঙ্কিমচন্দ্র স্বহস্তে বঙ্গভাষার সহিত যে দিন নবযৌবনপ্রাপ্ত ভাবের পরিণয় সাধন করাইয়াছিলেন, সেই দিনের সর্ব্বব্যাপী প্রফুল্লতা এবং আনন্দ উৎসব আমাদের মনে আছে। সেদিন আর নাই। আজ নানা লেখা, নানা মত, নানা আলোচনা আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। আজ কোন দিন বা ভাবের স্রোত মন্দ হইয়া আসে, কোন দিন বা অপেক্ষাকৃত পরিপুষ্ট হইয়া উঠে।

এইরূপ হইয়া থাকে এবং এইরূপই হওয়া আবশ্যক। কিন্তু কাহার প্রসাদে এরূপ হওয়া সম্ভব হইল সে কথা স্মরণ করিতে হইবে। আমরা আত্মাভিমানে সর্ব্বদাই তাহা ভুলিয়া যাই।

ভুলিয়া যে যাই তাহার প্রথম প্রমাণ, রামমোহন রায়কে আমাদের বর্ত্তমান বঙ্গদেশের নির্ম্মাণকর্ত্তা বলিয়া আমরা জানি না। কি রাজনীতি, কি বিদ্যাশিক্ষা, কি সমাজ, কি ভাষা, আধুনিক বঙ্গদেশে এমন কিছুই নাই, রামমোহন রায় স্বহস্তে যাহার সূত্রপাত করিয়া যান নাই। এমন কি, আজ প্রাচীন শাস্ত্রালোচনার প্রতি দেশের যে এক নূতন উৎসাহ দেখা যাইতেছে, রামমোহন রায় তাহারও পথপ্রদর্শক। যখন নবশিক্ষাভিমানে স্বভাবতঃই পুরাতন শাস্ত্রের প্রতি অবজ্ঞা জন্মিবার সম্ভাবনা, তখন রামমোহন রায় সাধারণের অনধিগম্য বিস্মৃত-প্রায় বেদপুরাণতন্ত্র হইতে সারোদ্ধার করিয়া প্রাচীন শাস্ত্রের গৌরব উজ্জ্বল রাখিয়াছিলেন।

বঙ্গদেশ অদ্য সেই রামমোহন রায়ের নিকট কিছুতেই হৃদয়ের সহিত কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতে চাহে না। রামমোহন বঙ্গসাহিত্যকে গ্রাণিট্‌স্তরের উপর স্থাপন করিয়া নিমজ্জন দশা হইতে উন্নত করিয়া তুলিয়াছিলেন, বঙ্কিমচন্দ্র তাহারই উপর প্রতিভার প্রবাহ ঢালিয়া স্তরবদ্ধ পলি-মৃত্তিকা ক্ষেপণ করিয়া গিয়াছেন। আজ বাংলাভাষা কেবল দৃঢ় বাসযোগ্য নহে, উর্ব্বরা শস্যশ্যামলা

হইয়া উঠিয়াছে। বাসভূমি যথার্থ মাতৃভূমি হইয়াছে। এখন আমাদের মনের খাদ্য প্রায় ঘরের দ্বারেই ফলিয়া উঠিতেছে।

মাতৃভাষার বন্ধ্য দশা ঘুচাইয়া যিনি তাহাকে এমন গৌরবশালিনী করিয়া তুলিয়াছেন, তিনি বাঙালীর যে কি মহৎ কি চিরস্থায়ী উপকার করিয়াছেন, সে কথা যদি কাহাকেও বুঝাইবার আবশ্যক হয় তবে তদপেক্ষা দুর্ভাগ্য আর কিছুই নাই। তৎপূর্ব্বে বাংলাকে কেহ শ্রদ্ধাসহকারে দেখিত না। সংস্কৃত পণ্ডিতেরা তাহাকে গ্রাম্য এবং ইংরাজি পণ্ডিতেরা বর্ব্বর জ্ঞান করিতেন। বাংলা ভাষায় যে কীর্ত্তি উপার্জ্জন করা যাইতে পারে সে কথা তাঁহাদের স্বপ্নের অগোচর ছিল। এই জন্য কেবল স্ত্রীলোক ও বালকের জন্য অনুগ্রহপূর্ব্বক দেশীয় ভাষায় তাঁহারা সরল পাঠ্যপুস্তক রচনা করিতেন। সেই সকল পুস্তকের সরলতা ও পাঠযোগ্যতা সম্বন্ধে যাঁহাদের জানিবার ইচ্ছা আছে, তাঁহারা রেভারেণ্ড্ কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়-রচিত পূর্ব্বতন এণ্ট্রেন্স্-পাঠ্য বাংলাগ্রন্থে দন্তস্ফুট করিবার চেষ্টা করিয়া দেখিবেন। অসম্মানিত বঙ্গভাষাও তখন অত্যন্ত দীন মলিনভাবে কালযাপন করিত। তাহার মধ্যে যে কতটা সৌন্দর্য্য, কতটা মহিমা প্রচ্ছন্ন ছিল, তাহা তাহার দারিদ্র্য ভেদ করিয়া স্ফূর্ত্তি পাইত না। যেখানে মাতৃভাষায় এত অবহেলা, সেখানে মানবজীবনের শুষ্কতা শূন্যতা দৈন্য কেহই দূর করিতে পারে না।

এমন সময়ে তখনকার শিক্ষিতশ্রেষ্ঠ বঙ্কিমচন্দ্র আপনার

সমস্ত শিক্ষা, সমস্ত অনুরাগ, সমস্ত প্রতিভা, উপহার লইয়া সেই সঙ্কুচিতা বঙ্গভাষার চরণে সমর্পণ করিলেন ; তখনকার কালে কি যে অসামান্য কাজ করিলেন, তাহা তাঁহারই প্রসাদে আজিকার দিনে আমরা সম্পূর্ণ অনুমান করিতে পারি না।

তখন তাঁহার অপেক্ষা অনেক অল্পশিক্ষিত প্রতিভাহীন ব্যক্তি ইংরাজিতে দুইছত্র লিখিয়া অভিমানে স্ফীত হইয়া উঠিতেন। ইংরাজি সমুদ্রে তাঁহারা যে কাঠবিড়ালীর মত বালির বাঁধ নির্ম্মাণ করিতেছেন, সেটুকু বুঝিবার শক্তিও তাঁহাদের ছিল না।

বঙ্কিমচন্দ্র যে সেই অভিমান, সেই খ্যাতির সম্ভাবনা অকাতরে পরিত্যাগ করিয়া তখনকার বিদ্বজ্জনের অবজ্ঞাত বিষয়ে আপনার সমস্ত শক্তি নিয়োগ করিলেন, ইহা অপেক্ষা বীরত্বের পরিচয় আর কি হইতে পারে? সম্পূর্ণ ক্ষমতাসত্ত্বেও আপন সমযোগ্য লোকের উৎসাহ এবং তাঁহাদের নিকট প্রতিপত্তির প্রলোভন পরিত্যাগ করিয়া, একটি অপরীক্ষিত অপরিচিত অনাদৃত অন্ধকার পথে আপন নবীন জীবনের সমস্ত আশা-উদ্যম-ক্ষমতাকে প্রেরণ করা, কত বিশ্বাস এবং কত সাহসের বলে হয়, তাহার পরিমাণ করা সহজ নহে।

কেবল তাহাই নহে। তিনি আপনার শিক্ষাগর্ব্বে বঙ্গ-ভাষার প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করিলেন না, একেবারেই শ্রদ্ধা প্রকাশ করিলেন। যত কিছু আশা, আকাঙ্ক্ষা, সৌন্দর্য্য,

প্রেম, মহত্ত্ব, ভক্তি, স্বদেশানুরাগ, শিক্ষিত পরিণত বুদ্ধির যত কিছু শিক্ষালব্ধ চিন্তাজাত ধন রত্ন, সমস্তই অকুণ্ঠিতভাবে বঙ্গ-ভাষার হস্তে অর্পণ করিলেন। পরম সৌভাগ্যগর্ব্বে সেই অনাদর-মলিন ভাষার মুখে সহসা অপূর্ব্ব লক্ষ্মীশ্রী প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিল।

তখন পূর্ব্বে যাঁহারা অবহেলা করিয়াছিলেন, তাঁহারা বঙ্গ-ভাষার যৌবন-সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট হইয়া একে একে নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিলেন। বঙ্গসাহিত্য প্রতিদিন গৌরবে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিতে লাগিল।

বঙ্কিম যে গুরুতর ভার লইয়াছিলেন তাহা অন্য কাহারও পক্ষে দুঃসাধ্য হইত। প্রথমতঃ, তখন বঙ্গভাষা যে অবস্থায় ছিল, তাহাকে যে শিক্ষিত ব্যক্তির সকল প্রকার ভাবপ্রকাশে নিযুক্ত করা যাইতে পারে, ইহা বিশ্বাস ও আবিষ্কার করা বিশেষ ক্ষমতার কার্য্য। দ্বিতীয়তঃ, যেখানে সাহিত্যের মধ্যে কোন আদর্শ নাই, যেখানে পাঠক অসামান্য উৎকর্ষের প্রত্যাশাই করে না, যেখানে লেখক অবহেলাভরে লেখে এবং পাঠক অনুগ্রহের সহিত পাঠ করে, যেখানে অল্প ভাল লিখিলেই বাহবা পাওয়া যায় এবং মন্দ লিখিলেও কেহ নিন্দা করা বাহুল্য বিবেচনা করে, সেখানে কেবল আপনার অন্তরস্থিত উন্নত আদর্শকে সর্ব্বদা সম্মুখে বর্ত্তমান রাখিয়া, সামান্য পরিশ্রমে সুলভ খ্যাতিলাভের প্রলোভন সম্বরণ করিয়া, অশ্রান্ত যত্নে অপ্রতিহত উদ্যমে দুর্গম পরিপূর্ণতার

পথে অগ্রসর হওয়া অসাধারণ মাহাত্ম্যের কর্ম্ম। চতুর্দ্দিক-ব্যাপী উৎসাহহীন জীবনহীন জড়ত্বের মত এমন গুরুভার আর কিছু নাই; তাহার নিয়ত প্রবল ভারাকর্ষণ শক্তি অতিক্রম করিয়া উঠা যে, কত নিরলস চেষ্টা ও বলের কর্ম্ম তাহা এখনকার সাহিত্যব্যবসায়ীরাও কতকটা বুঝিতে পারেন; তখন যে আরও কত কঠিন ছিল তাহা কষ্টে অনুমান করিতে হয়। সর্ব্বত্রই যখন শৈথিল্য এবং সে শৈথিল্য যখন নিন্দিত হয় না তখন আপনাকে নিয়মব্রতে বদ্ধ করা মহাসত্ত্বলোকের দ্বারাই সম্ভব।

বঙ্কিম আপনার অন্তরের সেই আদর্শ অবলম্বন করিয়া প্রতিভাবলে যে কার্য্য করিলেন তাহা অত্যাশ্চর্য্য। বঙ্গ-দর্শনের পূর্ব্ববর্ত্তী এবং তাহার পরবর্ত্তী বঙ্গসাহিত্যের মধ্যে যে উচ্চনীচতা তাহা অপরিমিত। দার্জ্জিলিং হইতে যাঁহারা কাঞ্চনজঙ্ঘার শিখরমালা দেখিয়াছেন, তাঁহারা জানেন সেই অভ্রভেদী শৈলসম্রাটের উদয়রবিরশ্মিসমুজ্জল তুষারকিরীট চতুর্দ্দিকের নিস্তব্ধ গিরিপারিষদ্‌বর্গের কত ঊর্দ্ধে সমুত্থিত হইয়াছে! বঙ্কিমচন্দ্রের পরবর্ত্তী বঙ্গসাহিত্য সেইরূপ আকস্মিক অত্যুন্নতি লাভ করিয়াছে; একবার সেইটি নিরীক্ষণ এবং পরিমাণ করিয়া দেখিলেই বঙ্কিমের প্রতিভার প্রভূত বল সহজে অনুমান করা যাইবে।

বঙ্কিম নিজে বঙ্গভাষাকে যে শ্রদ্ধা অর্পণ করিয়াছেন, অন্যেও তাহাকে সেইরূপ শ্রদ্ধা করিবে, ইহাই তিনি প্রত্যাশা

করিতেন। পূর্ব্ব অভ্যাসবশতঃ সাহিত্যের সহিত যদি কেহ ছেলেখেলা করিতে আসিত, তবে বঙ্কিম তাহার প্রতি এমন দণ্ড বিধান করিতেন যে, দ্বিতীয়বার সেরূপ স্পর্দ্ধা দেখাইতে সে আর সাহস করিত না।

তখন সময় আরো কঠিন ছিল। বঙ্কিম নিজে দেশব্যাপী একটি ভাবের আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছিলেন। সেই আন্দোলনের প্রভাবে কত চিত্ত চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল, এবং আপন ক্ষমতার সীমা উপলব্ধি করিতে না পারিয়া কত লোকে যে এক লম্ফে লেখক হইবার চেষ্টা করিয়াছিল তাহার সংখ্যা নাই। লেখার প্রয়াস জাগিয়া উঠিয়াছে অথচ লেখার উচ্চ আদর্শ তখন দাঁড়াইয়া যায় নাই। সেই সময় সব্যসাচী বঙ্কিম এক হস্ত গঠনকার্য্যে এক হস্ত নিবারণকার্য্যে নিযুক্ত রাখিয়াছিলেন। একদিকে অগ্নি জ্বালাইয়া রাখিতেছিলেন আর একদিকে ধূম এবং ভস্মরাশি দূর করিবার ভার নিজেই লইয়াছিলেন।

রচনা এবং সমালোচনা এই উভয় কার্য্যের ভার বঙ্কিম একাকী গ্রহণ করাতেই বঙ্গসাহিত্য এত সত্বর এমন দ্রুত পরিণতি লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছিল।

এই দুষ্কর ব্রতানুষ্ঠানের যে ফল তাহাও তাঁহাকে ভোগ করিতে হইয়াছিল। মনে আছে, বঙ্গদর্শনে যখন তিনি সমালোচক পদে আসীন ছিলেন, তখন তাঁহার ক্ষুদ্র শত্রুর সংখ্যা অল্প ছিল না। শত শত অযোগ্য লোক তাঁহাকে

ঈর্ষা করিত এবং তাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব অপ্রমাণ করিবার চেষ্টা করিতে ছাড়িত না।

কণ্টক যতই ক্ষুদ্র হৌক্ তাহার বিদ্ধ করিবার ক্ষমতা আছে; এবং কল্পনাপ্রবল লেখকদিগের বেদনাবোধও সাধারণের অপেক্ষা কিছু অধিক। ছোট ছোট দংশনগুলি যে বঙ্কিমকে লাগিত না, তাহা নহে, কিন্তু কিছুতেই তিনি কর্ত্তব্যে পরাঙ্মুখ হন নাই। তাঁহার অজেয় বল, কর্ত্তব্যের প্রতি নিষ্ঠা এবং নিজের প্রতি বিশ্বাস ছিল। তিনি জানিতেন বর্ত্তমানের কোন উপদ্রব তাঁহার মহিমাকে আচ্ছন্ন করিতে পারিবে না, সমস্ত ক্ষুদ্র শত্রুর ব্যূহ হইতে তিনি অনায়াসে নিষ্ক্রমণ করিতে পারিবেন। এইজন্য চিরকাল তিনি অম্লানমুখে বীরদর্পে অগ্রসর হইয়াছেন; কোন দিন তাঁহাকে রথবেগ খর্ব্ব করিতে হয় নাই।

সাহিত্যের মধ্যে দুই শ্রেণীর যোগী দেখা যায়, ধ্যান-যোগী এবং কর্ম্মযোগী। ধ্যানযোগী একান্তমনে বিরলে ভাবের চর্চ্চা করেন, তাঁহার রচনাগুলি সংসারী লোকের পক্ষে যেন উপ্‌রি-পাওনা—যেন যথালাভের মত।

কিন্তু বঙ্কিম সাহিত্যে কর্ম্মযোগী ছিলেন। তাঁহার প্রতিভা আপনাতে আপনি স্থিরভাবে পর্য্যাপ্ত ছিল না। সাহিত্যের যেখানে যাহা কিছু অভাব ছিল সর্ব্বত্রই তিনি আপনার বিপুল বল এবং আনন্দ লইয়া ধাবমান হইতেন। কি কাব্য, কি বিজ্ঞান, কি ইতিহাস, কি ধর্ম্মতত্ত্ব, যেখানে যখনই তাঁহাকে

আবশ্যক হইত, সেখানে তখনই তিনি সম্পূর্ণ প্রস্তুত হইয়া দেখা দিতেন। নবীন বঙ্গসাহিত্যের মধ্যে সকল বিষয়েই আদর্শ স্থাপন করিয়া যাওয়া তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। বিপন্ন বঙ্গভাষা আর্ত্তস্বরে যেখানেই তাঁহাকে আহ্বান করিয়াছে সেইখানেই তিনি প্রসন্ন চতুর্ভুজ মূর্ত্তিতে দর্শন দিয়াছেন।

কিন্তু তিনি যে কেবল অভয় দিতেন, সান্ত্বনা দিতেন, অভাব পূর্ণ করিতেন, তাহা নহে, তিনি দর্পহারীও ছিলেন! এখন যাঁহারা বঙ্গসাহিত্যের সারথ্য স্বীকার করিতে চান, তাঁহারা দিনে নিশীথে বঙ্গদেশকে অত্যুক্তিপূর্ণ স্তুতিবাক্যে নিয়ত প্রসন্ন রাখিতে চেষ্টা করেন কিন্তু বঙ্কিমের বাণী কেবল স্তুতিবাদিনী ছিল না, খড়্গধারিণীও ছিল। বঙ্গদেশ যদি অসাড় প্রাণহীন না হইত, তবে কৃষ্ণচরিত্রে বর্ত্তমান পতিত হিন্দুসমাজ ও বিকৃত হিন্দুধর্ম্মের উপর যে অস্ত্রাঘাত আছে, সে আঘাতে বেদনাবোধ এবং কথঞ্চিৎ চেতনা লাভ করিত। বঙ্কিমের ন্যায় তেজস্বী প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তি ব্যতীত আর কেহই লোকাচার দেশাচারের বিরুদ্ধে এরূপ নির্ভীক স্পষ্ট উচ্চারণে আপন মত প্রকাশ করিতে সাহস করিত না। এমন কি, বঙ্কিম প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্রের প্রতি ঐতিহাসিক বিচার প্রয়োগ করিয়া তাহার সার এবং অসার ভাগ পৃথকী-করণ, তাহার প্রামাণ্য এবং অপ্রামাণ্য অংশের বিশ্লেষণ, এমন নিঃসঙ্কোচে করিয়াছেন যে এখনকার দিনে তাহার তুলনা পাওয়া কঠিন।

বিশেষতঃ দুই শত্রুর মাঝখান দিয়া তাঁহাকে পথ কাটিয়া চলিতে হইয়াছে। একদিকে, যাঁহারা অবতার মানেন না তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি দেবত্বারোপে বিপক্ষ হইয়া দাঁড়ান। অন্যদিকে যাঁহারা শাস্ত্রের প্রত্যেক অক্ষর এবং লোকাচারের প্রত্যেক প্রথাকে অভ্রান্ত বলিয়া জ্ঞান করেন তাঁহারাও, বিচারের লৌহাস্ত্র দ্বারা শাস্ত্রের মধ্য হইতে কাটিয়া কাটিয়া কুঁদিয়া কুঁদিয়া মহত্তম মনুষ্যের আদর্শ অনুসারে দেবতাগঠন-কার্য্যে বড় প্রসন্ন হন নাই। এরূপ অবস্থায় অন্য কেহ হইলে কোন এক পক্ষকে সর্ব্বতোভাবে আপন দলে পাইতে ইচ্ছা করিতেন। কিন্তু সাহিত্য-মহারথী বঙ্কিম দক্ষিণে বামে উভয় পক্ষের প্রতিই তীক্ষ্ণ শরচালন করিয়া অকুণ্ঠিতভাবে অগ্রসর হইয়াছেন—তাঁহার নিজের প্রতিভা কেবল তাঁহার একমাত্র সহায় ছিল। তিনি যাহা বিশ্বাস করিয়াছেন তাহা স্পষ্ট ব্যক্ত করিয়াছেন—বাক্‌চাতুরী দ্বারা আপনাকে বা অন্যকে বঞ্চনা করেন নাই।

কল্পনা এবং কাল্পনিকতা দুইয়ের মধ্যে একটি মস্ত প্রভেদ আছে। যথার্থ কল্পনা, যুক্তি সংযম এবং সত্যের দ্বারা সুনির্দ্দিষ্ট আকারবদ্ধ—কাল্পনিকতার মধ্যে সত্যের ভাণ আছে মাত্র কিন্তু তাহা অদ্ভুত আতিশয্যে অসঙ্গতরূপে স্ফীতকায়। তাহার মধ্যে যেটুকু আলোকের লেশ আছে, ধূমের অংশ তাহার শতগুণ। যাহাদের ক্ষমতা অল্প, তাহারা সাহিত্যের প্রায় এই প্রধূমিত কাল্পনিকতার আশ্রয় লইয়া থাকে—কারণ,

ইহা দেখিতে প্রকাণ্ড কিন্তু প্রকৃতপক্ষে অত্যন্ত লঘু। এক শ্রেণীর পাঠকেরা এইরূপ ভূরিপরিমাণ কৃত্রিম কাল্পনিকতার নৈপুণ্যে মুগ্ধ এবং অভিভূত হইয়া পড়েন এবং দুর্ভাগ্যক্রমে বাংলায় সেই শ্রেণীর পাঠক বিরল নহে।

এইরূপ অপরিমিত অসংযত কল্পনার দেশে বঙ্কিমের স্থায় আদর্শ আমাদের পক্ষে অত্যন্ত মূল্যবান্। কৃষ্ণচরিত্রে উদ্দাম ভাবের আবেগে তাঁহার কল্পনা কোথাও উচ্ছৃঙ্খল হইয়া ছুটিয়া যায় নাই। প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত সর্ব্বত্রই তিনি পদে পদে আত্মসম্বরণপূর্ব্বক যুক্তির সুনির্দ্দিষ্ট পথ অবলম্বন করিয়া চলিয়াছেন। যাহা লিখিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার প্রতিভা প্রকাশ পাইয়াছে; যাহা লিখেন নাই, তাহাতেও তাঁহার অল্প ক্ষমতা প্রকাশ পায় নাই।

বিশেষতঃ বিষয়টি এমন যে, ইহা কোন সাধারণ বাঙালী লেখকের হস্তে পড়িলে তিনি এই সুযোগে বিস্তর হরিহরি, মরিমরি, হায় হায়, অশ্রুপাত ও প্রবল অঙ্গভঙ্গী করিতেন এবং কল্পনার উচ্ছ্বাস, ভাবের আবেগ এবং হৃদয়াতিশয্য প্রকাশ করিবার এমন অনুকূল অবসর কখনই ছাড়িতেন না; সুবিচারিত তর্ক দ্বারা, সুকঠিন সত্য নির্ণয়ের স্পৃহা দ্বারা পদে পদে আপন লেখনীকে বাধা দিতেন না; সর্ব্বজনগম্য সরল পথ ছাড়িয়া দিয়া সূক্ষ্মবুদ্ধি দ্বারা স্বকপোলকল্পিত একটা নূতন আবিষ্কারকেই সর্ব্বপ্রাধান্য দিয়া তাহাকেই বাক্‌প্রাচুর্য্যে এবং কল্পনাকুহকে সমাচ্ছন্ন করিয়া তুলিতেন, এবং নিজের বিশ্বাস

ও ভাষাকে যথাসাধ্য টানিয়া বুনিয়া আশে পাশে দীর্ঘ করিয়া অধিক পরিমাণ লোককে আপন মতের জালে আকর্ষণ করিতে চেষ্টা করিতেন।

বস্তুতঃ আমাদের শাস্ত্র হইতে ইতিহাস উদ্ধারের দুরূহ ভার কেবল বঙ্কিম লইতে পারিতেন। এক দিকে হিন্দু-শাস্ত্রের প্রকৃত মর্ম্মগ্রহণে য়ুরোপীয়গণের অক্ষমতা, অন্যদিকে শাস্ত্রগত প্রমাণের নিরপেক্ষ বিচার সম্বন্ধে হিন্দুদিগের সঙ্কোচ; একদিকে রীতিমত পরিচয়ের অভাব, অন্যদিকে অতিপরিচয়-জনিত অভ্যাস এবং সংস্কারের অন্ধতা; যথার্থ ইতিহাসটিকে এই উভয়সঙ্কটের মাঝখান হইতে উদ্ধার করিতে হইবে। দেশানুরাগের সাহায্যে শাস্ত্রের অন্তরে প্রবেশ করিতে হইবে এবং সত্যানুরাগের সাহায্যে তাহার অমূলক অংশ পরিত্যাগ করিতে হইবে। যে বন্যার ইঙ্গিতে লেখনীকে বেগ দিতে হইবে, সেই বন্যার আকর্ষণে তাহাকে সর্ব্বদা সংযত করিতে হইবে। এই সকল ক্ষমতাসামঞ্জস্য বঙ্কিমের ছিল। সেই জন্য মৃত্যুর অনতিপূর্ব্বে তিনি যখন প্রাচীন বেদ পুরাণ সংগ্রহ করিয়া প্রস্তুত হইয়া বসিয়াছিলেন, তখন বঙ্গসাহিত্যের বড় আশার কারণ ছিল, কিন্তু মৃত্যু সে আশা সফল হইতে দিল না, এবং আমাদের ভাগ্যে যাহা অসম্পন্ন রহিয়া গেল, তাহা যে কবে সমাধা হইবে কেহই বলিতে পারে না।

বঙ্কিম এই যে সর্ব্বপ্রকার আতিশয্য এবং অসঙ্গতি হইতে আপনাকে রক্ষা করিয়া গিয়াছেন ইহা তাঁহার

প্রতিভার প্রকৃতিগত। যে কেহ তাঁহার রচনা পড়িয়াছেন, সকলেই জানেন বঙ্কিম হাস্যরসে সুরসিক ছিলেন। যে পরিষ্কার যুক্তির আলোকের দ্বারা সমস্ত আতিশয্য ও অসঙ্গতি প্রকাশ হইয়া পড়ে হাস্যরস সেই কিরণেরই একটি রশ্মি। কতদূর পর্য্যন্ত গেলে একটি ব্যাপার হাস্যজনক হইয়া উঠে, তাহা সকলে অনুভব করিতে পারে না; কিন্তু যাঁহারা হাস্য-রসরসিক তাঁহাদের অন্তঃকরণে একটি বোধশক্তি আছে, যদ্দ্বারা তাঁহারা সকল সময়ে নিজের না হইলেও অপরের কথাবার্ত্তা, আচার-ব্যবহার, এবং চরিত্রের মধ্যে সুসঙ্গতির সূক্ষ্ম সীমাটুকু সহজে নির্ণয় করিতে পারেন।

নির্ম্মল শুভ্র সংযত হাস্য বঙ্কিমই সর্ব্বপ্রথমে বঙ্গসাহিত্যে আনয়ন করেন। তৎপূর্ব্বে বঙ্গসাহিত্যে হাস্যরসকে অন্য রসের সহিত এক পংক্তিতে বসিতে দেওয়া হইত না। সে নিম্নাসনে বসিয়া শ্রাব্য অশ্রাব্য ভাষায় ভাঁড়ামি করিয়া সভাজনের মনোরঞ্জন করিত। আদিরসেরই সহিত যেন তাহার কোন একটি সর্ব্বউপদ্রবসহ বিশেষ কুটুম্বিতার সম্পর্ক ছিল এবং ঐ রসটাকেই সর্ব্বপ্রকারে পীড়ন ও আন্দোলন করিয়া তাহার অধিকাংশ পরিহাস বিদ্রূপ প্রকাশ পাইত। এই প্রগল্‌ভ বিদূষকটি যতই প্রিয়পাত্র থাক্, কখনও সম্মানের অধিকারী ছিল না। যেখানে গম্ভীরভাবে কোন বিষয়ের আলোচনা হইত সেখানে হাস্যের চপলতা সর্ব্বপ্রযত্নে পরিহার করা হইত।

বঙ্কিম সর্ব্বপ্রথমে হাস্যরসকে সাহিত্যের উচ্চ শ্রেণীতে উন্নীত করেন। তিনিই প্রথমে দেখাইয়া দেন যে, কেবল প্রহসনের সীমার মধ্যে হাস্যরস বদ্ধ নহে; উজ্জল শুভ্র হাস্য সকল বিষয়কেই আলোকিত করিয়া তুলিতে পারে। তিনিই প্রথম দৃষ্টান্তের দ্বারা প্রমাণ করাইয়া দেন যে, এই হাস্য-জ্যোতির সংস্পর্শে কোন বিষয়ের গভীরতার গৌরব হ্রাস হয় না, কেবল তাহার সৌন্দর্য্য এবং রমণীয়তা বৃদ্ধি হয়, তাহার সর্ব্বাংশের প্রাণ এবং গতি যেন সুস্পষ্টরূপে দীপ্যমান হইয়া উঠে। যে বঙ্কিম বঙ্গসাহিত্যের গভীরতা হইতে অশ্রুর উৎস উন্মুক্ত করিয়াছেন, সেই বঙ্কিম আনন্দের উদয়শিখর হইতে নব-জাগ্রত বঙ্গসাহিত্যের উপর হাস্যের আলোক বিকীর্ণ করিয়া দিয়াছেন।

কেবল সুসঙ্গতি নহে, সুরুচি এবং শিষ্টতার সীমা নির্ণয় করিতেও একটি স্বাভাবিক সূক্ষ্ম বোধশক্তির আবশ্যক। মাঝে মাঝে অনেক বলিষ্ঠ প্রতিভার মধ্যে সেই বোধশক্তির অভাব দেখা যায়। কিন্তু বঙ্কিমের প্রতিভায় বল এবং সৌকুমার্য্যের একটি সুন্দর সম্মিশ্রণ ছিল। নারীজাতির প্রতি যথার্থ বীরপুরুষের মনে যেরূপ একটি সসম্ভ্রম সম্মানের ভাব থাকে, তেমনই সুরুচি এবং শীলতার প্রতি বঙ্কিমের বলিষ্ঠ বুদ্ধির একটি ভদ্রোচিত বীরোচিত প্রীতিপূর্ণ শ্রদ্ধা ছিল। বঙ্কিমের রচনা তাহার সাক্ষ্য। বর্ত্তমান লেখক যে দিন প্রথম বঙ্কিমকে দেখিয়াছিল, সেদিন একটি ঘটনা ঘটে

যাহাতে বঙ্কিমের এই স্বাভাবিক সুরুচিপ্রিয়তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

সেদিন লেখকের আত্মীয় পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর মহোদয়ের নিমন্ত্রণে তাঁহাদের মরকতকুঞ্জে কলেজ-রিয়্যুনিয়ন্ নামক মিলনসভা বসিয়াছিল। ঠিক কত দিনের কথা ভাল স্মরণ নাই কিন্তু আমি তখন বালক ছিলাম। সেদিন সেখানে আমার অপরিচিত বহুতর যশস্বী লোকের সমাগম হইয়াছিল। সেই বুধমণ্ডলীর মধ্যে একটি ঋজু দীর্ঘকায় উজ্জ্বলকৌতুকপ্রফুল্লমুখ গুম্ফধারী প্রৌঢ় পুরুষ চাপকানপরিহিত বক্ষের উপর দুই হস্ত আবদ্ধ করিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। দেখিবামাত্রই যেন তাঁহাকে সকলের হইতে স্বতন্ত্র এবং আত্মসমাহিত বলিয়া বোধ হইল। আর সকলে জনতার অংশ, কেবল তিনি যেন একাকী একজন। সেদিন আর কাহার পরিচয় জানিবার জন্য আমার কোনরূপ প্রয়াস জন্মে নাই, কিন্তু তাঁহাকে দেখিয়া তৎক্ষণাৎ আমি এবং আমার একটি আত্মীয় সঙ্গী একসঙ্গেই কৌতূহলী হইয়া উঠিলাম। সন্ধান লইয়া জানিলাম তিনিই আমাদের বহুদিনের অভিলষিতদর্শন লোকবিশ্রুত বঙ্কিম বাবু। মনে আছে প্রথম দর্শনেই তাঁহার মুখশ্রীতে প্রতিভার প্রখরতা এবং বলিষ্ঠতা এবং সর্ব্বলোক হইতে তাঁহার একটি সুদূর স্বাতন্ত্র্যভাব আমার মনে অঙ্কিত হইয়া গিয়াছিল। তাহার পর অনেক বার তাঁহার সাক্ষাৎলাভ করিয়াছি,

তাঁহার নিকট অনেক উৎসাহ এবং উপদেশ প্রাপ্ত হইয়াছি, এবং তাঁহার মুখশ্রী স্নেহের কোমলহাস্যে অত্যন্ত কমনীয় হইতে দেখিয়াছি, কিন্তু প্রথম দর্শনে সেই যে তাঁহার মুখের উদ্যত খড়্গের ন্যায় একটি উজ্জ্বল সুতীক্ষ্ণ প্রবলতা দেখিতে পাইয়াছিলাম, তাহা আজ পর্য্যন্ত বিস্মৃত হই নাই।

সেই উৎসব উপলক্ষে একটি ঘরে একজন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত দেশানুরাগমূলক স্বরচিত সংস্কৃত শ্লোক পাঠ এবং তাহার ব্যাখ্যা করিতেছিলেন। বঙ্কিম একপ্রান্তে দাঁড়াইয়া শুনিতেছিলেন। পণ্ডিত মহাশয় সহসা একটি শ্লোকে পতিত ভারতসন্তানকে লক্ষ্য করিয়া একটা অত্যন্ত সেকেলে পণ্ডিতী রসিকতা প্রয়োগ করিলেন, সে রস কিঞ্চিৎ বীভৎস হইয়া উঠিল। বঙ্কিম তৎক্ষণাৎ একান্ত সঙ্কুচিত হইয়া দক্ষিণ করতলে মুখের নিম্নার্দ্ধ ঢাকিয়া পার্শ্ববর্ত্তী দ্বার দিয়া দ্রুতবেগে অন্য ঘরে পলায়ন করিলেন।

বঙ্কিমের সেই সসঙ্কোচ পলায়ন-দৃশ্যটি অদ্যাবধি আমার মনে মুদ্রাঙ্কিত হইয়া আছে।

বিবেচনা করিয়া দেখিতে হইবে, ঈশ্বর গুপ্ত যখন সাহিত্যগুরু ছিলেন, বঙ্কিম তখন তাঁহার শিষ্যশ্রেণীর মধ্যে গণ্য ছিলেন। সে সময়কার সাহিত্য অন্য যে কোন প্রকার শিক্ষা দিতে সমর্থ হৌক, ঠিক সুরুচি শিক্ষার উপযোগী ছিল না। সে সময়কার অসংযত বাক্-যুদ্ধ এবং আন্দোলনের মধ্যে দীক্ষিত ও বর্দ্ধিত হইয়া ইতরতার প্রতি বিদ্বেষ,

সুরুচির প্রতি শ্রদ্ধা এবং শ্লীলতা সম্বন্ধে অক্ষুণ্ণ বেদনাবোধ রক্ষা করা যে, কি আশ্চর্য্য ব্যাপার তাহা সকলেই বুঝিতে পারিবেন। দীনবন্ধুও বঙ্কিমের সমসাময়িক এবং তাঁহার বান্ধব ছিলেন কিন্তু তাঁহার লেখায় অন্য ক্ষমতা প্রকাশ হইলেও তাহাতে বঙ্কিমের প্রতিভার এই ব্রাহ্মণোচিত শুচিতা দেখা যায় নাই। তাঁহার রচনা হইতে ঈশ্বর গুপ্তের সময়ের ছাপ কালক্রমে ধৌত হইতে পারে নাই।

আমাদের মধ্যে যাঁহারা সাহিত্যব্যবসায়ী তাঁহারা বঙ্কিমের কাছে যে কি চিরঋণে আবদ্ধ তাহা যেন কোন কালে বিস্মৃত না হন। এতদিন আমাদের বঙ্গভাষা কেবল একতারা যন্ত্রের মত এক তারে বাঁধা ছিল, কেবল সহজ সুরে ধর্ম্ম সঙ্কীর্ত্তন করিবার উপযোগী ছিল; বঙ্কিম স্বহস্তে তাহাতে এক একটি করিয়া তার চড়াইয়া আজ তাহাকে বীণাযন্ত্রে পরিণত করিয়া তুলিয়াছেন। পূর্ব্বে যাহাতে কেবল স্থানীয় গ্রাম্যসুর বাজিত, আজ তাহা বিশ্বসভায় শুনাইবার উপযুক্ত ধ্রুবপদ অঙ্গের কলাবতী রাগিণী আলাপ করিবার যোগ্য হইয়া উঠিয়াছে। সেই তাঁহার স্বহস্ত-সম্পূর্ণ স্নেহপালিত ক্রোড়সঙ্গিনী বঙ্গভাষা আজ বঙ্কিমের জন্য অন্তরের সহিত রোদন করিয়া উঠিয়াছে। কিন্তু তিনি এই শোকোচ্ছ্বাসের অতীত শান্তিধামে দুষ্কর জীবনযজ্ঞের অবসানে নির্ব্বিকার নিরাময় বিশ্রাম লাভ করিয়াছেন। মৃত্যুর পরে তাঁহার মুখে একটি কোমল

প্রসন্নতা, একটি সর্ব্বদুঃখতাপহীন গভীর প্রশান্তি উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছিল—যেন জীবনের মধ্যাহ্নরৌদ্রদগ্ধ কঠিন সংসারতল হইতে মৃত্যু তাঁহাকে স্নেহ-সুশীতল জননীক্রোড়ে তুলিয়া লইয়াছে। আজ আমাদের বিলাপ পরিতাপ তাঁহাকে স্পর্শ করিতেছে না, আমাদের ভক্তি-উপহার গ্রহণ করিবার জন্য সেই প্রতিভাজ্যোতির্ম্ময় সৌম্য প্রসন্নমূর্ত্তি এখানে উপস্থিত নাই। আমাদের এই শোক এই ভক্তি কেবল আমাদেরই কল্যাণের জন্য। বঙ্কিম সাহিত্যক্ষেত্রে যে আদর্শ স্থাপন করিয়া গিয়াছেন, এই শোকে এই ভক্তিতে সেই আদর্শপ্রতিমা আমাদের অন্তরে উজ্জ্বল এবং স্থায়ীরূপে প্রতিষ্ঠিত হৌক। প্রস্তরের মূর্ত্তি স্থাপনের অর্থ এবং সামর্থ্য আমাদের যদি না থাকে, তবে একবার তাঁহার মহত্ত্ব সর্ব্বতোভাবে মনের মধ্যে উপলব্ধি করিয়া তাঁহাকে আমাদের বঙ্গহৃদয়ের স্মরণস্তম্ভে স্থায়ী করিয়া রাখি। ইংরেজ এবং ইংরেজের আইন চিরস্থায়ী নহে; রাজনৈতিক, ধর্ম্মনৈতিক, সমাজনৈতিক মতামত সহস্রবার পরিবর্ত্তিত হইতে পারে; যে সকল ঘটনা এবং যে সকল অনুষ্ঠান আজ সর্ব্বপ্রধান বলিয়া বোধ হইতেছে এবং যাহার উন্মাদনার কোলাহলে সমাজের খ্যাতিহীন শব্দহীন কর্ত্তব্যগুলিকে নগণ্য বলিয়া ধারণা হইতেছে, কাল তাহার স্মৃতিমাত্র চিহ্নমাত্র অবশিষ্ট থাকিতে না পারে; কিন্তু যিনি আমাদের মাতৃভাষাকে সর্ব্বপ্রকার ভাবপ্রকাশের অনুকূল করিয়া গিয়াছেন তিনি

এই হতভাগ্য দরিদ্র দেশকে একটি অমূল্য চিরসম্পদ দান করিয়াছেন। তিনি স্থায়ী জাতীয় উন্নতির একমাত্র মূল উপায় স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। তিনিই আমাদের নিকট যথার্থ শোকের মধ্যে সান্ত্বনা, অবনতির মধ্যে আশা, শ্রান্তির মধ্যে উৎসাহ এবং দারিদ্র্যের শূন্যতার মধ্যে চির-সৌন্দর্য্যের অক্ষয় আকর উদ্‌ঘাটিত করিয়া দিয়াছেন। আমাদিগের মধ্যে যাহা কিছু অমর এবং আমাদিগকে যাহা কিছু অমর করিবে, সেই সকল মহাশক্তিকে ধারণ করিবার, পোষণ করিবার, প্রকাশ করিবার, এবং সর্ব্বত্র প্রচার করিবার এক-মাত্র উপায় যে মাতৃভাষা তাহাকেই তিনি বলবতী এবং মহীয়সী করিয়াছেন।

রচনাবিশেষের সমালোচনা ভ্রান্ত হইতে পারে—আমা-দিগের নিকট যাহা প্রশংসিত কালক্রমে শিক্ষা, রুচি এবং অবস্থার পরিবর্ত্তনে আমাদের উত্তর পুরুষের নিকট তাহা নিন্দিত এবং উপেক্ষিত হইতে পারে, কিন্তু বঙ্কিম বঙ্গভাষার ক্ষমতা এবং বঙ্গসাহিত্যের সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করিয়া দিয়াছেন; তিনি ভগীরথের ন্যায় সাধনা করিয়া বঙ্গসাহিত্যে ভাব-মন্দাকিনীর অবতারণ করিয়াছেন এবং সেই পুণ্যস্রোতস্পর্শে জড়ত্বপাশ মোচন করিয়া আমাদের প্রাচীন ভস্মরাশিকে সঞ্জীবিত করিয়া তুলিয়াছেন, ইহা কেবল সাময়িক মত নহে, এ কথা কোন বিশেষ তর্ক বা রুচির উপর নির্ভর করিতেছে না, ইহা একটা ঐতিহাসিক সত্য।

এই কথা স্মরণে মুদ্রিত করিয়া সেই বাংলা লেখকদিগের গুরু, বাংলা পাঠকদিগের সুহৃদ্, এবং সুজলা সুফলা মলয়জ-শীতলা বঙ্গভূমির মাতৃবৎসল প্রতিভাশালী সন্তানের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করি, যিনি জীবনের সায়াহ্ন আসিবার পূর্ব্বেই, নূতন অবকাশে নূতন উদ্যমে নূতন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবার প্রারম্ভেই, আপনার অপরিম্লান প্রতিভারশ্মি সংহরণ করিয়া, বঙ্গসাহিত্যাকাশ ক্ষীণতর জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর হস্তে সমর্পণপূর্ব্বক গত শতাব্দীর বর্ষশেষের পশ্চিম দিগন্তসীমায় অকালে অস্তমিত হইলেন।

অশ্বিনীকুমার

বঙ্গ-গৌরব অশ্বিনীকুমার আর ইহজগতে নাই। বাঙালী যে কি রত্ন হারাইয়াছে, বঙ্গ-জননী যে কতদূর ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন, তাহা ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না।

অশ্বিনীকুমার কে? তিনি কি ছিলেন? সংক্ষেপে বলিতে গেলে তিনি বাংলার একজন যথার্থ ও অনন্যসাধারণ লোক-নায়ক ছিলেন।

অশ্বিনীকুমার শিক্ষিত, কিন্তু কোনও বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ছিলেন না; সদ্বক্তা, কিন্তু দৈবীপ্রতিভাসম্পন্ন বাগ্মী ছিলেন না। সুললিত বাক্য যোজনা করিয়া তিনি বহু লোককে উপদেশ দিতে পারিতেন, কিন্তু শব্দ ও ভাবের বন্যা ছুটাইয়া



অশ্বিনীকুমার দত্ত

তাহাদিগকে আত্মহারা করিয়া ক্ষেপাইয়া তুলিতে পারিতেন না। তিনি সাহিত্যিক,—তাঁহার 'ভক্তিযোগ' বাংলাভাষার একখানি অতি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ; কিন্তু যে সাহিত্য-সৃষ্টির দ্বারা সমাজে নূতন আদর্শ ও নূতন উৎসাহ ফুটিয়া উঠে, সে সৃষ্টি-শক্তি তাঁহার ছিল না। তিনি দরিদ্র ছিলেন না, পিতৃদত্ত সম্পত্তির দ্বারা তাঁহার সাংসারিক সচ্ছলতা সম্পাদিত হইত, কিন্তু যতটা ধনের অধিকারী হইলে, সেই ধনের শক্তিতে লোকে সমাজপতি হইয়া উঠে, অশ্বিনীকুমারের সে বিভব ছিল না। বি, এল, পাশ করিয়া অশ্বিনীকুমার কিছুদিন ওকালতি করিয়াছিলেন; সে দিকে মনোনিবেশ করিলে তিনি আধুনিক ব্যবহারজীবিগণের অগ্রণীদলভুক্ত হইতে পারিতেন না যে, এমনও মনে হয় না। কিন্তু অশ্বিনীকুমার সে দিকে বিধিমত চেষ্টা করেন নাই। সুতরাং বড় উকীল কৌন্সিলী হইয়াও লোকে সমাজে যে প্রতিপত্তি ও প্রভাব লাভ করে, অশ্বিনী-কুমার তাহা পান নাই। সরকারী কর্ম্মে কৃতিত্বের দ্বারাও সমাজে এক জাতীয় নেতৃত্বলাভ করা যায়। অশ্বিনীকুমারের পিতা উচ্চ রাজকর্ম্মচারী ছিলেন; ইচ্ছা করিলে অশ্বিনী-কুমারও সহজেই একটা ডেপুটিগিরি জুটাইতে পারিতেন, আর তাঁহার বিদ্যার ও চরিত্রের গুণে রাজকার্য্যে তিনি যে খুবই কৃতিত্ব এবং উন্নতি লাভ করিতে পারিতেন, সে বিষয়েও বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু অশ্বিনীকুমার এ সকলের কিছুই করেন নাই। যে গুণ থাকিলে, যে কর্ম্ম ও কৃতিত্ব-

বলে, সচরাচর আমাদের মধ্যে লোকনেতৃত্বলাভ হয় অশ্বিনী-কুমার তাহার কিছুরই দাবী করিতে পারেন না। তথাপি, তাঁহার মত এমন সত্য ও সাচ্চা লোক-নায়ক বাংলার প্রসিদ্ধ কর্ম্মিগণের মধ্যে অতি অল্পই দেখা যায়।

ফলতঃ আমার মনে হয় যে, আমাদের চিন্তানায়ক অনেক আছেন, কিন্তু লোকনায়ক নাই। কেহ বক্তা; কেহ কবি; কেহ মসীজীবী; কেহ ব্যবহারজীবী; কেহ বা ধনে, কেহ বা পদে বড়। এই সকল লোকে মিলিয়া দেশের মনের গতি ও কর্ম্মের আদর্শ বদলাইয়া দিয়াছেন ও দিতেছেন। ইঁহারা না থাকিলে বাংলা আজ যেখানে গিয়া দাঁড়াইয়াছে, সেখানে যাইতে পারিত না। ইঁহারা দেশের প্রাণতা বাড়াইয়া দিয়াছেন, লোক-চরিত্রকে উদার ও উন্নত করিয়াছেন। কিন্তু ইঁহারা কেহই, সত্য অর্থে, লোকনায়ক নহেন। লোকে ইঁহাদের পুস্তক আনন্দ করিয়া পড়ে, ইঁহাদের বক্তৃতা আগ্রহ করিয়া শোনে, ইঁহাদের গুণগান প্রাণ খুলিয়া করে; ইঁহাদিগকে সভাসমিতিতে উচ্চ আসনে লইয়া গিয়া বসায়, পথে দেখা হইলে সসম্ভ্রমে ইঁহাদিগকে পথ ছাড়িয়া দেয়; দেশহিতকর অনুষ্ঠানাদিতে ইঁহাদিগকে আদর করিয়া পৌরহিত্যে বরণ করে। এ সকলই করে; করে না কেবল সত্যভাবে, ইঁহাদের অনুবর্ত্তন। যতদিন লোকের মনের সঙ্গে ইঁহাদের কথা মিলিয়া যায়, লোকের ভাবের সঙ্গে ইঁহাদের উপদেশ মিশ খায়, লোকে যাহা

আপনা হইতে চাহে যতদিন ইহারা সে পথে নিজেরা চলিতে ও তাহাদিগকে চালাইতে রাজি থাকেন, ততদিন ইহাদিগকে সকলে মাথায় করিয়া রাখে। কিন্তু মতভেদ উপস্থিত হইলেই ইহাদিগকে অবলীলাক্রমে, সরাসরিভাবে, ছাড়িয়া আসিতেও দ্বিধা-বোধ করে না। ইহাকে প্রকৃত লোকনায়কত্ব বলে না, বা বলা সঙ্গত নহে।

প্রকৃত লোকনায়ক এদেশে ক্রমে লোপ পাইয়া যাইতেছে। এক সময়ে, হিন্দু ও মুসলমান-সমাজে, যে জাতীয় লোকনায়ক স্বচক্ষে দেখিয়াছি, তাহা আর আজ দেখিতে পাই না। ইহার প্রধান কারণ এই যে, আমাদের আধুনিক শিক্ষাতে আমাদিগকে দেশের লোকের প্রাণ হইতে ক্রমশঃই যেন দূরে লইয়া গিয়া ফেলিতেছে। প্রথমতঃ আমাদের পিতৃপিতামহেরা যে ভাবে আপন আপন গ্রামের সঙ্গে একাত্ম হইয়া বাস করিতেন, আমরা আর তাহা করি না। তাঁহারাও সময় সময়, বিষয়-কর্ম্মের খাতিরে গ্রাম ছাড়িয়া দূরদূরান্তরে বাস করিতেন বটে, কিন্তু অনেক স্থলেই তাঁহাদের স্ত্রীপুত্রেরা গ্রামেই থাকিতেন। যেক্ষেত্রে তাঁহারা পরিবার সঙ্গে লইয়া কর্ম্মস্থলে যাইতেন, সেখানেও গ্রামের সমাজের সঙ্গে তাঁহাদের প্রাণগত, অন্তরঙ্গ যোগ কখনও নষ্ট হইত না। বিদেশে প্রবাসে তাঁহারা অশেষ ক্লেশ স্বীকার করিয়া যে অর্থ উপার্জ্জন করিতেন, গ্রামে আসিয়া, আপনার আত্মীয়কুটুম্ব, প্রতিবেশী ও বন্ধুবর্গের মধ্যেই সে অর্থ ব্যয়

করিতেন। পরোক্ষভাবে দশে তাঁহাদের অর্থের ভাগী ও ভোগী হইত; সাক্ষাৎভাবে তাঁহারা তাঁহাদের প্রতিপত্তি ও প্রতিষ্ঠার দ্বারা সময়ে অসময়ে অনেক সাহায্যলাভ করিতেন। বিবাহ ও শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া-কর্ম্মে, দোলদুর্গোৎসবাদি নৈমিত্তিক পূজাপার্ব্বণে, নিত্য দেবসেবা ও অতিথিসেবার ভিতর দিয়া গ্রামের লোকের সঙ্গে তাঁহাদের একটা নিকট সম্বন্ধ জমাট হইয়া যাইত। আর এই জন্য তাঁহারা যেখানে যাইয়া দাঁড়াইতেন, শত শত লোক সেখানে যাইয়া তাঁহাদের পৃষ্ঠপোষক হইয়া দাঁড়াইত। তাঁহারা যে কাজ করিতে যাইতেন, সকলে সে কাজে রত হইত। তাঁহারা যে পথ দেখাইতেন, সকলে বিনা ওজরে, বিনা বিচারে, সে পথ ধরিয়া চলিত। তখন দেশে সত্যকার লোক-নেতৃত্ব ছিল। ইঁহারাই সেকালে প্রকৃত লোক-নায়ক ছিলেন।

আর আজ 'তে হি নো দিবসাঃ গতাঃ'। সে দিনও নাই—সে সমাজও নাই! লোকে লেখাপড়া শিখিয়া, যাহারা লেখাপড়া জানে না তাহাদের নিকট হইতে পৃথক্ হইয়া পড়ে। আমাদের দেশে 'শিক্ষিত' ও 'অশিক্ষিতে'র, 'বিজ্ঞ' ও 'অজ্ঞে'র মধ্যে এককালে এ সাংঘাতিক ব্যবধান ছিল না। গ্রামের বিদ্যাভূষণ বা তর্কসিদ্ধান্ত বা ন্যায়ালঙ্কার মহাশয়ের বাড়ীতে আপামর সাধারণ সকলের অবাধ গতিবিধি ছিল। তাঁহার চতুষ্পাঠীতে, যখন তিনি শিষ্যমণ্ডলী-বেষ্টিত হইয়া ব্যাকরণ বা স্মৃতি বা ন্যায়ের অধ্যাপনা করাইতেন, তখনও

গ্রামের চাষী ও ব্যবসায়ীরা তাঁহার কাছে যাইয়া নীরবে বসিয়া থাকিত এবং তাঁহার তামাকাদি সাজিয়া, তাঁহার সেবাশুশ্রূষায় নিযুক্ত হইত। তাহাদের সঙ্গে তাঁহার বিদ্যার ব্যবধান যাই থাকুক না কেন, প্রাণের ব্যবধান বড় বেশী ছিল না। আর এই একপ্রাণতা নিবন্ধন, দেশের আপামর সাধারণে এ সকল উদারচরিত ব্রাহ্মণের শাস্ত্রজ্ঞান লাভ না করিয়াও, তাঁহাদের চরিত্রের প্রভাবে, কথাবার্ত্তার গুণে অনেকটা সুশিক্ষিত হইয়া উঠিত। এ শিক্ষা স্কুল-পাঠশালায় মিলে না; আমরা একটু আধটু লেখাপড়া শিখিয়া, চিন্তায়, ভাবে, আদর্শে, অভ্যাসে, সকল বিষয়ে দেশের লোক হইতে এতটা পৃথক হইয়া পড়িয়াছি যে, তাহাদের কথা আমাদের মিষ্ট লাগে না, আমাদের কথাও তাহাদের বোধগম্য হয় না। তাহাদের আমোদপ্রমোদে আমরা গা ঢালিয়া দিতে পারি না; আমাদের উৎসব-ব্যসনাদিতেও তাহারা আমাদের কাছে ঘেঁষিতে পারে না। আমাদের বাড়ীতে তাহারা সাহস করিয়া আসে না, আমরাও আমাদের ক্রিয়াকর্ম্মে তাহাদিগকে আদর করিয়া ডাকি না। ইংরেজকে তাহারা যে ভাবে দেখে, যেরূপ সম্মান করে, আমাদিগকেও প্রায় সেইরূপই করে। আর এই জন্য দেশের লোকে যেমন ইংরেজের শাসন মানিয়া চলে, কিন্তু আপনা হইতেই প্রাণের টানে সরকারের অনুবর্ত্তন করে না, আমাদের আন্দোলন-আলোচনাদিতেও এখন দেশের লোকে ঠিক ঐ ভাবেই

এই বে-সরকারী স্কুল-কলেজের প্রতিষ্ঠাতৃগণের প্রায় অপর সকলেই, এগুলিকে জীবিকা-উপার্জ্জনের একটা প্রশস্ত উপায়-রূপে গ্রহণ করেন। কিন্তু অশ্বিনীকুমার তাহা করেন নাই। সে প্রয়োজনও তাঁহার ছিল না। ফলতঃ আমাদের দেশে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পরে, অশ্বিনীকুমারের মত আর কেহ এতটা নিঃস্বার্থভাবে স্বদেশীয়দিগের মধ্যে ইংরেজি শিক্ষা প্রচার কবিবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হন নাই। এইজন্য আজ পর্য্যন্ত অশ্বিনীকুমারের স্কুল ও কলেজের পরিচালনা-কার্য্যে কোনও প্রকারের ব্যবসাদারীর পরিচয় পাওয়া যায় নাই। অশ্বিনীকুমার লোকশিক্ষার জন্য বহু বৎসর ধরিয়া আপনার সময়, শক্তি এবং অর্থ অকাতরে দান করিয়াছেন, কখন তাহার এক কপর্দ্দকেরও প্রতিদানের প্রত্যাশা করেন নাই। এই জন্যই বোধ হয় তাঁহার শিক্ষার ও চরিত্রের প্রভাব এ দেশের, বিশেষতঃ পূর্ব্ববঙ্গের, ইংরেজি শিক্ষাপ্রাপ্ত যুবকমণ্ডলীর মধ্যে এতটা ছডাইয়া পডিয়াছে। স্কুল ও কলেজ খুলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্দ্দিষ্ট গ্রন্থাবলী পডাইয়াই যুবকগণের শিক্ষার কাজ শেষ হইল, অশ্বিনীকুমার কখন এমনটা মনে করিতেন না। শিষ্যদের চরিত্রগঠনের জন্যও তিনি সর্ব্বদা প্রাণপণ চেষ্টা করিতেন। চরিত্রগঠনের উপায় কেবলমাত্র উপদেশ নহে, কিন্তু সদনুষ্ঠান। অশ্বিনীকুমার আপনার স্কুল ও কলেজের যুবকমণ্ডলীর মধ্যে ক্রমে ক্রমে বিবিধ সদনুষ্ঠানের প্রতিষ্ঠা করিতে আরম্ভ করেন। চরিত্র-

গঠনের মূলে পরার্থপরতাসাধন। লোকসেবার ভিতর দিয়া যে ভাবে ও যে পরিমাণে এই পরার্থপরতা সাধন করিতে পারা যায়, আর কোনও উপায়ে তাহা পারা যায় না। অশ্বিনীকুমারের শিষ্যেরা দল বাঁধিয়া আর্ত্তজনের সেবায় নিযুক্ত হইতেন। বহুদিন হইতেই বরিশালে মাঝে মাঝে বিস্চিকার নিরতিশয় প্রাদুর্ভাব হইয়া থাকে। অশ্বিনীকুমারের স্কুল এবং কলেজের যুবকেরা সে সব সময়ে জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে লোকের ঘরে ঘরে যাইয়া রোগীর শুশ্রূষা করিয়াছেন। মামলা-মোকদ্দমা উপলক্ষে পল্লীগ্রাম হইতে বহুলোক সর্ব্বদাই বরিশালে যাতায়াত করে। বরিশাল মুসলমান-প্রধান স্থান। সহরের এই সকল অভ্যাগতদিগের মধ্যে মুসলমানদিগের সংখ্যাই বেশী। ইহারা সহরে আসিয়া মোসাফেরখানায় বা হোটেলে আশ্রয় লইয়া থাকে। এই সকল হোটেলে স্বাস্থ্যরক্ষার কোন ব্যবস্থাই যে নাই, ইহা বলা বাহুল্য মাত্র; বিশেষতঃ আপনার পরিবার পরিজন হইতে দূরে আসিয়া এরূপ বন্ধুহীন স্থানে বিস্চিকা দ্বারা আক্রান্ত হইলে লোকের কত না দুর্গতি হয়, ইহা সহজেই অনুমান করা যায়। অশ্বিনীকুমারের শিষ্যেরা সর্ব্বদা নিতান্ত আপনার জনের মত এই সকল অসহায় রোগীর সেবা করিয়া আসিয়াছেন। ব্রাহ্মণ, বৈদ্য এবং কায়স্থ সন্তানেরা বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করিয়া ইহাদিগের মল মূত্র পরিষ্কার করিয়াছেন। অশ্বিনীকুমার এবং তাঁহার

বন্ধুবর্গ অকাতরে এই সকল বিপন্ন লোকের ঔষধ এবং পথ্যাদির ব্যবস্থা দিয়াছেন। বরিশালের এই সেবকদল অনেক বন্ধুহীন লোকের মৃতদেহের সৎকার পর্য্যন্ত করিয়াছেন। অশ্বিনীকুমারের শিষ্যেরা বিপন্ন রোগীর শুশ্রূষা করিতে যাইয়া কখন কোন দিন কোন প্রকারের জাতিবর্ণের বিচার করেন নাই। আকালে, অন্নকষ্টে, হিন্দুমুসলমান-নির্ব্বিশেষে ইঁহারা দেশের এবং বিদেশের সম্পন্ন লোকদিগের নিকট হইতে দ্বারে দ্বারে অর্থ ভিক্ষা করিয়া বিপন্ন জনের ক্ষুন্নিবারণের উপায় করিয়া দিয়াছেন। অশ্বিনীকুমারের লোকসেবা কেবল যে সহরে আবদ্ধ ছিল তাহা নহে।

বহু দিন হইতে অশ্বিনীকুমারের স্বাস্থ্য ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল। কতকটা নিজের শারীরিক স্বাস্থ্যের জন্য, আর কতকটা আপনার বিষয়কর্ম্ম উপলক্ষেও তিনি আপনার জেলার ভিন্ন ভিন্ন স্থানে নৌকাযোগে ঘুরিয়া বেড়াইতেন। এই সকল সফরের সময় দেশের গরীব লোকেরা সর্ব্বদাই নানা বিষয়ে তাঁহার সাহায্য এবং সেবা পাইয়া আসিয়াছে; অশ্বিনীকুমারের নৌকা কোথাও লাগিয়াছে শুনিলেই সে স্থানের গরীব লোকেরা আপন আপন শরীর-মনের বোঝা লইয়া নিতান্ত আপনার জন ভাবিয়া তাঁহার নিকটে যাইয়া উপস্থিত হইত। রোগী ঔষধ চায়, দরিদ্র অর্থ চায়, জিজ্ঞাসু উপদেশ চায়, আর যাহার চাহিবার কিছু নাই, সেও তাঁহাকে চক্ষে দেখিয়া কেবল মাত্র কৃতার্থ হইবার জন্য তাঁহার কাছে যাইয়া

উপস্থিত হইত। সকলের অভাব বা প্রার্থনা যে তিনি সর্ব্বদা পূরণ করিতে পারিতেন, তাহা নহে। ভগবানের নিকটেও মানুষ সর্ব্বদা কত কি চায়, কিন্তু যাহা চায় তাহাই যে পায়, এমন নহে; তথাপি ঈপ্সিতলাভ না হইলেও তাহাদের প্রাণে শান্তিলাভ হইয়া থাকে। অশ্বিনীকুমারের সম্বন্ধেও কতকটা তাহাই হইত। সকলের প্রার্থনা পূরণ করা তাঁহার সাধ্যাতীত, কোন মানুষই তাহা পারে না। তবে মিষ্ট কথায়, স্নেহসিক্ত সম্ভাষণে, অন্তরের সহানুভূতি ও সমবেদনা দিয়া সকল মানুষই অপর মানুষের প্রাণটা ঠাণ্ডা করিয়া দিতে পারে। অশ্বিনীকুমার এটী সর্ব্বদাই করিতেন। এই জন্য বরিশালের জনসাধারণের সঙ্গে বহুদিন হইতে তাঁহার একটা গভীর প্রাণের যোগ গড়িয়া উঠিয়াছিল।

কি সহজ উপায়ে, তিনি লোকের মনোরঞ্জন করিতেন, আমাদের পক্ষে অনেক সময় তাহা কল্পনা করিয়া উঠাও অসম্ভব হইয়া পড়ে। একটী সামান্য ঘটনার কথা মনে পড়িল। সে বেশী দিনের কথা নয়; স্বদেশী আন্দোলনের তখন খুব প্রাদুর্ভাব। বরিশালে একটা অতি বিস্তৃত ও স্বল্পবিস্তর সঙ্গতিসম্পন্ন নমঃশূদ্র-সমাজ আছে। ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ খৃষ্টীয়ান হইয়া গিয়াছে; কেহ কেহ লেখা-পড়াও শিখিয়াছে। এই সকল সূত্রে পাশ্চাত্য সাম্যবাদের প্রভাবও কিয়ৎ পরিমাণে এই নমঃশূদ্র-সমাজে প্রবেশ করিয়াছে। নমঃশূদ্রেরা কোনও বিষয়েই দেশের অপরাপর

শূদ্রগণ অপেক্ষা হীন নহে ; অথচ ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ প্রভৃতি উচ্চতর শ্রেণীর লোকেরা স্বচ্ছন্দে অপর শূদ্রদের জল গ্রহণ করেন ; নমঃশূদ্রের জল গ্রহণ করেন না। নমঃ-শূদ্রেরা এজন্য আপনাদিগকে অযথা অপমানিত মনে করিয়া এই প্রথার বিরুদ্ধে একটী প্রবল আন্দোলন জাগাইয়া তুলিয়াছেন। স্বদেশীর মুখে নমঃশূদ্রদের এই আন্দোলনটা বেশ বাড়িয়া উঠে। স্বদেশীদলের আত্মবিরোধ বাধাইবার জন্য স্বদেশীর বিরোধীগণ নমঃশূদ্রদিগের এই আন্দোলনে নানা ভাবে ইন্ধন প্রদান করিতে আরম্ভ করে। বরিশালের একজন নিষ্ঠাবান্ স্বদেশসেবককে কেহ বলেন যে, "বাবুরা ত 'বন্দে মাতরম্' বলিয়া ভাই ভাই একঠাঁই করিয়াছেন, কিন্তু তোমাদিগকে নমঃশূদ্র বলিয়া ঘৃণা করেন কেন ? ভদ্রসমাজে তোমাদের জল চলে না, হুঁকা চলে না, তবুও তোমরা তাহাদের ভাই ; কথাটী মন্দ নয়।" এ কথা শুনিয়া এই ব্যক্তির মনে একটা খট্‌কা বাধিয়া যায়। সে সময়ে অশ্বিনীবাবু সেই অঞ্চলেই উপস্থিত ছিলেন। আপনার সন্দেহ মিটাইবার জন্য এই নমঃশূদ্র স্বদেশসেবক অশ্বিনীকুমারের নিকট যাইয়া উপস্থিত হইলেন। অশ্বিনীকুমারের সঙ্গে তাঁহার পূর্ব্বে সাক্ষাৎ পরিচয় ছিল না। অশ্বিনীকুমার আপনার নৌকায় নিজের শয্যার উপরে বসিয়া ছিলেন। শয্যার নিকটেই একটা ফরাশ পাতা ছিল। নমঃশূদ্রটী অশ্বিনীকুমারের প্রকোষ্ঠের দ্বারদেশে যাইয়া তাঁহাকে নমস্কার করিলেন ;

অশ্বিনীকুমারও অমনি দাঁড়াইয়া অভ্যাগতকে প্রতিনমস্কার করিলেন এবং সেই প্রকোষ্ঠের ভিতরে তাঁহাকে ডাকিয়া তাঁহার পরিচয় লইয়া তাঁহার সঙ্গে যাইয়া সেই ফরাশে বসিলেন। তারপর অশ্বিনীকুমার তাঁহার প্রয়োজন জানিতে চাহিলে নমঃশূদ্রটী বলিলেন—"বাবু আমি আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করিতে আসিয়াছিলাম, কিন্তু তাহা জিজ্ঞাসা করা এক্ষণে অনাবশ্যক; আমার প্রশ্নের উত্তর আমি পাইয়াছি। আপনি যখন আমাকে লইয়া এক বিছানায় বসিয়া কথা কহিয়াছেন তাহাতেই বুঝিয়াছি, 'বন্দে মাতরম্' সত্য এবং আমরা আপনাদের ভাই।" ঘটনাটী অতি ক্ষুদ্র, কিন্তু ইহাতে কি সহজ, কি সামান্য ও স্বাভাবিক উপায়ে অশ্বিনীকুমার বরিশালে সর্ব্বসাধারণের চিত্তের উপর আপনার এই অনন্যপ্রতিদ্বন্দ্বী সাম্রাজ্য বিস্তার করিয়াছিলেন, ইহা বুঝিতে পারা যায়।

সাধারণতঃ অশ্বিনীকুমার হিন্দুসমাজের সমস্ত বিধি-নিষেধের পরিপোষক ছিলেন, কিন্তু কর্ত্তব্যের প্রেরণায় তিনি সকল সংস্কারের গণ্ডী কাটাইয়া উঠিতেন। জাতিভেদের বিরুদ্ধে তিনি কখনও বক্তৃতা দেন নাই, কিন্তু সামাজিক কর্ত্তব্য এবং মানবের কল্যাণের জন্য অনেক স্থলেই তিনি জাতিভেদ প্রথার গ্রন্থি শিথিল করিয়াছিলেন। তাঁহার শিক্ষার ফলে, কলেরা বা অন্য মহামারীর প্রকোপের সময়, তাঁহার বিদ্যালয়ের ছাত্রবৃন্দ, উচ্চনীচ জাতিনির্ব্বিচারে, পীড়িতের

সেবা শুশ্রূষার ভার গ্রহণ করিয়া থাকে। এমন অনেক স্থলে দেখিয়াছি, কুলীন ব্রাহ্মণ সন্তানেরা, বিন্দুমাত্র দ্বিধা বা সঙ্কোচ না করিয়া, স্বহস্তে নীচজাতীয় রোগীর বিছানাদি, মলমূত্রাদি পর্য্যন্ত, পরিষ্কার করিয়াছে; এমন কি সময়ে সময়ে, লোকাভাব ঘটিলে, অস্পৃশ্য চণ্ডালাদির মৃতদেহও আপন স্কন্ধে বহিয়া সৎকার করিয়া আসিয়াছে। দুর্ভিক্ষ এবং মন্বন্তরের সময়, হিন্দু ও মুসলমান দুঃস্থ ব্যক্তিগণ তুল্যভাবে অশ্বিনীকুমারের সেবা পাইয়া আসিয়াছে। তাহাদের কাছে তিনি একজন প্রসিদ্ধ বাগ্মী, ম্যাজিষ্ট্রেটের সহচর বা কমিশনরের বিশ্বস্ত বন্ধু ছিলেন না; তাহারা তাঁহাকে তাহাদেরই একজন অন্তরঙ্গ বন্ধু, দুর্দ্দিনের সহায়, এবং দুঃখে কষ্টে একান্ত প্রিয়জন বলিয়াই জানিত। অগাধ অর্থ দিয়া নহে, বাগ্মিত্বের মোহিনী শক্তিবলেও নহে, জ্ঞানগরিমার প্রভাবেও নহে, কিন্তু জনসাধারণের সহিত চিন্তায়, ভাবে ও কার্য্যে সম্পূর্ণ এক হইয়া যাওয়াই যথার্থ জননায়কের বিশেষত্ব। আমরা এদেশে একমাত্র অশ্বিনীকুমারের লোকনেতৃত্বেই ইহার কতকটা আভাস পাইয়া থাকি। বহু বৎসরের নিঃস্বার্থ সামাজিক সেবাই জনসাধারণের হৃদয়-মন্দিরে তাঁহার জন্য এক অক্ষয় স্বর্ণ-সিংহাসনের প্রতিষ্ঠা করিয়াছে।

পরিবর্জ্জিত।

